**KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA**
**18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009**

| | |
|---|---|
| Record No. : KLMLGK 2007/ | Place of Publication : ৩নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলকাতা |
| Collection : KLMLGK | Publisher : প্রমথ চৌধুরী |
| Title : সবুজপত্র (Sabuj Patra) | Size : 7.5"x6" |
| Vol. & Number : 4/1<br>4/2<br>4/3<br>4/4<br>4/5 | Year of Publication : বৈশাখ ১৩২৮<br>জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮<br>আষাঢ় ১৩২৮<br>শ্রাবণ ১৩২৮<br>ভাদ্র ১৩২৮ |
| | Condition : Brittle / Good ✓ |
| Editor : প্রমথ চৌধুরী | Remarks : |

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

# সঙ্গীতের মুক্তি।

—:০:—

সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য সঙ্গীত-সঙ্ঘ হইতে আমাকে অনুরোধ করা হইয়াছে। ফরমাস এই যে, দিশি বিলাতি কোনটাকে যেন বাদ দেওয়া না হয়। বিষয়টা গুরুতর এবং তাহা আলোচনা করিবার একটি মাত্র যোগ্যতা আমার আছে। তাহা এই যে, দিশি এবং বিলাতি কোনো সঙ্গীতই আমি জানি না।

তা বলিয়া জানি না বলিতে এতটা দূর বোঝায় না যে, সঙ্গীতের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নাই। সম্পর্কটা কি রকম সেটা একটু খোলসা করিয়া বলা চাই।

পৃথিবীতে দুই রকমের জানা আছে। এক, ব্যবসায়ীর জানা, আর এক অব্যবসায়ীর জানা। ব্যবসায়ী জানে, যেটা জানা সহজ নয়, অর্থাৎ নাড়ি নক্ষত্র। আর অব্যবসায়ী জানে, যেটা জানা নিতান্তই সহজ, অর্থাৎ হাবভাব, চালচলন।

এই নাড়ি নক্ষত্র জানাটাই প্রকৃত জানা এমন একটা অন্ধসংস্কার সংসারে চলিত আছে। তাই সরলহৃদয় আনাড়িদের মনে সর্ব্বদাই একটা ভয় থাকে, ঐ নাড়িনক্ষত্র পদার্থটা না জানি কি! আর, ব্যবসায়ী লোকেরা ঐ নাড়ি নক্ষত্রের দোহাই দিয়া অব্যবসায়ী লোকের মুখ চাপা দিয়া রাখেন।

অথচ জগতে ওস্তাদ কয়েকজন মাত্র, আর অধিকাংশই আনাড়ি। বর্ত্তমান যুগের প্রধান সর্দ্দার হচ্চে ডিমক্রেসি, সাধুভাষায় যাকে বলে "অধিকাংশ।" অতএব, এ যুগে আনাড়িরও কথা বলিবার অধিকার আছে। এমন কি, তার অধিকারই বেশী। যে বলে আমি জানি সেই কেবল কথা কহিয়া যাইবে, আর যে জানে আমি জানি না সেই চুপ করিয়া যাইবে এখনকার কালের এমন ধর্ম্ম নহে। অতএব আজ আমি গান সম্বন্ধে যা বলিব তা সেই আনাড়িদের প্রতিনিধিরূপে।

কিন্তু মনে থাকে যেন আনাড়িদের একজন মাত্র প্রতিনিধিতে কুলায় না। সব সেয়ানের এক মত, কেননা তাদের বাঁধা রাস্তা; যারা সেয়ানা নয় তাদের অনেক মত কেননা তাদের রাস্তাই নাই। তাই বহু সেয়ানার এক প্রতিনিধি চলে কিন্তু অসেয়ানাদের মধ্যে যত-গুলিই মানুষ ততগুলিই প্রতিনিধি। অতএব হিসাব নিকাশের সময় হয়ত দেখিবেন আমার মতের মিল একব্যক্তির সঙ্গেই আছে, এবং সে ব্যক্তি আমার মধ্যেই বিরাজমান।

আনাড়ির মস্ত সুবিধা এই যে, সানাড়ির চেয়ে তার অভিজ্ঞতার সুযোগ বেশী। কেননা, পথ একটা বই নয় কিন্তু অপথের সীমা নাই, সে দিক দিয়া যে চলে সে-ই বেশী দেখে বেশী ঠেকে। আমি পথ জানিনা বলিয়াই হোক্ কিম্বা আমার মনটা লক্ষ্মীছাড়া স্বভাবের বলিয়াই হোক্ এতদিন গানের ঐ অপথ এবং আঘাটা দিয়াই চলিয়াছি। সুতরাং আমার অভিজ্ঞতায় যাহা মিলিয়াছে তাহা শাস্ত্রের সঙ্গে মেলে না। এটা নিশ্চয়ই অপরাধের বিষয় কিন্তু সেই জন্যই হয়ত মনোরম হইতে পারে।

কাব্যকলা বা চিত্রকলা দুটি ব্যক্তিকে লইয়া। যে-মানুষ রচনা করে



আর যে-মানুষ ভোগ করে। গীতিকলায় আরো একজন প্রবেশ করিয়াছে। রচয়িতা এবং শ্রোতার মাঝখানে আছে ওস্তাদ। মধ্যস্থ পদার্থটা বিন্ধ্য পর্ব্বতের মত বাধাও হইতে পারে আবার সুয়েজ ক্যানা-লের মত সুযোগও হইতে পারে। তবু যাই হোক্, উপসর্গ বাড়িলে বিপদও বাড়ে। রসের স্রষ্টা এবং রসের ভোক্তা এই দুয়ের উপযুক্ত মত সমাবেশ, সংসারে এইই ত যথেষ্ট দুর্লভ—তার উপরে আবার রসের বাহনটি—ত্রৈগুণ্যের এমন পরিপূর্ণ সম্মিলন বড় কঠিন। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, দুয়ের যোগে সঙ্গ, তিনের যোগে গোলযোগ।

ইন্দ্রের চেয়ে ইন্দ্রের ঐরাবতের বিপুলতা নিশ্চয়ই অনেক গুণে বড়। গীতিকলায় তেমনি ওস্তাদ অনেক খানি জায়গা জুড়িয়াছেন। দেবতার চেয়ে পাণ্ডাকে যেমন ঢের বেশী খাতির করিতে হয় তেমনি আসরে ওস্তাদের খাতির স্বয়ং সঙ্গীতকেও যেন ছাড়াইয়া যায়। কৃষ্ণ বড় কি রাধা বড় এ তর্ক শুনিয়াছি, কিন্তু মথুরার রাজসভার দারোয়ানজি বড় কি না এই তর্কটা বাড়িল।

যে লোক মাঝারি সে তার মাঝখানের নির্দ্দিষ্ট জায়গাটিতে সন্তুষ্ট থাকে না, সে প্রমাণ করিতে চায় যে, সে-ই যেন উপরওয়ালা। উত্তমের বিনয় স্বাভাবিক, অধমের বিনয় দায়ে পড়িয়া, কিন্তু জগতে সব চেয়ে দুঃসহ ঐ মধ্যম। রাজা মানুষটি ভালোই, আর প্রজা ত মাটির মানুষ, কিন্তু আমলা! তার কথা চাপিয়া যাওয়াই ভালো! নিজের "রাজ-কর্ম্মচারী" নামটার প্রথম অংশটাই তার মনে থাকে, দ্বিতীয় অংশটা কিছুতেই সে মুখস্থ করিয়া উঠিতে পারে না। এই কারণেই যেখানে প্রজার হাতে কোনো ক্ষমতাই নাই সেখানে আমলাতন্ত্র অর্থাৎ ব্যুরো-

Missing Page(s)

ক্রেসি উচুদরের জিনিস হইতে পারে না। আমাদের সঙ্গীতে এই ব্যুরোক্রেসির আধিপত্য ঘটিল।

এইখানে য়ুরোপের সঙ্গীত-পলিটিক্সের সঙ্গে আমাদের সঙ্গীত-পলিটিক্সের তফাৎ। সেখানে ওস্তাদকে অনেক বেশী বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকিতে হয়। গানের কর্ত্তা নিজের হাতে সীমানা পাকা করিয়া দেন, ওস্তাদ সেটা সম্পূর্ণ বজায় রাখেন। তাঁকে যে নিতান্ত আড়ষ্ট হইয়া থাকিতে হইবে তাও নয়, আবার খুব যে দাপাদপি করিবেন সে রাস্তাও বন্ধ।

য়ুরোপের প্রত্যেক গান একটি বিশেষ ব্যক্তি, সে আপনার মধ্যে প্রধানত আত্মমর্য্যাদাই প্রকাশ করে। ভারতে প্রত্যেক গান একটি বিশেষ জাতীয়, সে আপনার মধ্যে প্রধানত জাতিমর্য্যাদাই প্রকাশ করে। য়ুরোপীয় ওস্তাদকে সাবধানে গানের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলিতে হয়। আমাদের দেশের গানে ব্যক্তিত্ব আছে, কেবল সে কোন্ জাতি তাই সন্তোষজনকরূপে প্রমাণ করিবার জন্যে। য়ুরোপে গান-সম্বন্ধে যে-কর্তৃত্ব গান-রচয়িতার, আমাদের দেশে তাহাই দুইজনে বখ্‌রা করিয়া লইয়াছে, গানওয়ালা এবং গাহনে-ওয়ালা। যেখানে কর্তৃত্বের এমন জুড়ি হাঁকানো হয় সেখানে রাস্তাটা চওড়া চাই। গানের সেই চওড়া রাস্তার নাম রাগরাগিণী। সেটা গানকর্ত্তার প্রাইভেট রাস্তা নয়, সেখানে ট্রেস্‌পাসের আইন খাটে না।

এক হিসাবে এ বিধিটা ভালোই। যে-মানুষ গান বাঁধিবে আর যে-মানুষ গান গাহিবে দু'জনেই যদি সৃষ্টিকর্ত্তা হয় তবে ত রসের গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম। যে-গান গাওয়া হইতেছে সেটা যে কেবল আবৃত্তি নয় তাহা যে তখন-তখনি জীবন উৎস হইতে তাজা উঠিতেছে এটা অনুভব করিলে



শ্রোতার আনন্দ অক্লান্ত অম্লান হইয়া থাকে। কিন্তু মুস্কিল এই যে সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা জগতে বিরল। যাদের শক্তি আছে তারা গান বাঁধে, আর যাদের শিক্ষা আছে তারা গান গায়, সাধারণত এরা দুই জাতের মানুষ। দৈবাৎ ইহাদের জোড় মেলে কিন্তু প্রায় মেলে না। ফলে দাঁড়ায় এই যে, কলাকৌশলের কলা অংশটা থাকে গানকর্ত্তার ভাগে, আর ওস্তাদের ভাগে পড়ে কৌশল অংশটা। কৌশল জিনিসটা খাদ হিসাবেই চলে, সোনা হিসাবে নয়। কিন্তু ওস্তাদের হাতে খাদের মিশল বাড়িতেই থাকে। কেননা, ওস্তাদ মানুষটাই মাঝারি, এবং মাঝারির প্রভুত্বই জগতে সব চেয়ে বড় দুর্ঘটনা। এই জন্যে ভারতের বৈঠকী সঙ্গীত কালক্রমে সুরসভা ছাড়িয়া অসুরের কুস্তির আখড়ায় নামিয়াছে। সেখানে তানমানলয়ের তাণ্ডবটাই প্রবল হইয়া ওঠে, আসল গানটা ঝাপ্‌সা হইয়া থাকে।

রসবোধের নাড়ি যখন ক্ষীণ হইয়া আসে কৌশল তখন কলাকে ছাড়াইয়া যায় সাহিত্যের ইতিহাসেও ইহা বরাবর দেখা গেছে। এদেশে গানের যখন ভরা যৌবন ছিল তখন এমন সব ওস্তাদ নিশ্চয়ই সর্ব্বদা মিলিত গান গাওয়াই যাঁদের স্বভাব, গানের পালোয়ানি করা যাঁদের ব্যবসা নয়। বুলবুলি তখন গানেরই খ্যাতি পাইত লড়াইয়ের নয়। তখন এমন সকল শ্রোতাও নিশ্চয় ছিল যাঁরা সঙ্গীত ভাট-পাড়ার বিধান যাচাইয়া গানের বিচার করিতেন না। কেননা, শুনিবারও প্রতিভা থাকা চাই কেবল শুনাইবার নয়।

আমাদের কালোয়াতি গানের এই যে রাগরাগিণী ইহার রসটা কি? রাগ শব্দের গোড়াকার মানে রং। এই শব্দটা যখন মনের সম্বন্ধে ব্যবহার করা হয় তখন বোঝায় ভালো লাগা। বাংলায় রাগ

কথাটার মানে ক্রোধ। ইংরেজিতে passion বলিতে ভালো লাগা আর ক্রোধ দুইই বোঝায়। ভালো লাগা আর ক্রোধ এই দুয়ের মধ্যে একটা ঐক্য আছে। এই দুটো ভাবেই চিত্ত উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। এই দুয়েরই এক রং, সেই রংটা রাঙা। ওটা রক্তের রং, হৃদয়ের নিজের আভা।

বিশ্বের একটা হৃদয়ের আভা নিয়ত প্রকাশ পাইতেছে। ভোর-বেলাকার আকাশে হাওয়ায় এমন কিছু-একটা আছে, যেটা কেবলমাত্র বস্তু নয়, ঘটনা নয়, যেটা কেবল রস। এই রসের ক্ষেত্রেই আমাদের অন্তরের সঙ্গে বাহিরের রাগ অনুরাগের মিল। এই মিলের তত্ত্বটি অনির্ব্বচনীয়। যাহা নির্ব্বচনীয় তাহা পৃথক, তাহা আপনাতে আপনি সুনির্দ্দিষ্ট। যেখানে পদ্মফুলের নির্ব্বচনীয়তা সেখানে তার আকার আয়তন ও বস্তুপরিমাণ সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধভাবে তার আপনারই। কিন্তু যেখানে পদ্মটি অনির্ব্বচনীয় সেখানে সে যেন আপনার সমস্তটার চেয়েও আপনি অনেক বেশী। এই বেশীটুকুই তার সঙ্গীত।

পদ্মের যেখানে এই বেশী সেখানে তার সঙ্গে আমার বেশীরও একটা গভীর মিল। তাই ত গাহিতে পারি

আজি কমল-মুকুলদল খুলিল!
দুলিলরে দুলিল
মানস সরসে রসপুলকে;
পলকে পলকে ঢেউ তুলিল!
গগন মগন হল গন্ধে,
সমীরণ মূর্চ্ছে আনন্দে;



গুন্ গুন্ গুঞ্জন ছন্দে
মধুকর ঘিরি ঘিরি বন্দে;
নিখিল ভুবন মন ভুলিল
মন ভুলিল রে . .
মন ভুলিল!

হৃদয়ের আনন্দে আর পদ্মে অভেদ হইল—ভাষার একেবারে উলট পালট হইয়া গেল। যার রূপ নাই সে রূপ ধরিল, যার রূপ আছে সে অরূপ হইল। এমন সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড ঘটিতেছে কোথায়? সৃষ্টি যেখানে অনির্ব্বচনীয়তায় আপনাকে আপনি ছাড়াইয়া যাইতেছে।

আমাদের রাগরাগিণীতে সেই অনির্ব্বচনীয় বিশ্বরসটিকে নানা বড় বড় আধারে ধরিয়া রাখার চেষ্টা হইয়াছে। যখন কল হয় নাই তখন কলিকাতায় গঙ্গার জল যেমন করিয়া জালায় ধরা হইত। যজ্ঞকর্ত্তা আপন ইচ্ছা ও শক্তি অনুসারে নানা গড়নের ও নানা ধাতুর পাত্রে সেই রস পরিবেষণ করিতে পারেন কিন্তু একই সাধারণ জলাশয় হইতে সেটা বহিয়া আনা।

অর্থাৎ আমাদের মতে রাগরাগিণী বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে নিত্য আছে। সেইজন্য আমাদের কালোয়াতি গানটা ঠিক যেন মানুষের গান নয়, তাহা যেন সমস্ত জগতের। ভৈরোঁ যেন ভোর বেলার আকাশেরই প্রথম জাগরণ; পরজ যেন অবসন্ন রাত্রিশেষের নিদ্রাবিহ্বলতা; কানাড়া যেন ঘনান্ধকারে অভিসারিকা নিশীথিনীর পথবিস্মৃতি; ভৈরবী যেন সঙ্গবিহীন অসীমের চির বিরহ বেদনা; মুলতান যেন

রৌদ্রতপ্ত দিনান্তের ক্লান্তি-নিশ্বাস ; পূরবী যেন শূন্যগৃহচারিণী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রুমোচন।

ভারতবর্ষের সঙ্গীত মানুষের মনে বিশেষ ভাবে এই বিশ্বরসটিকেই রসাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছে। মানুষের বিশেষ বেদনাগুলিকে বিশেষ করিয়া প্রকাশ করা তার অভিপ্রায় নয়। তাই যে সাহানার সুর অচঞ্চল ও গভীর, যাহাতে আমোদ আহ্লাদের উল্লাসতা নাই তাহাই আমাদের বিবাহ উৎসবের রাগিণী। নর নারীর মিলনের মধ্যে যে চিরকালীন বিশ্বতত্ত্ব আছে সেইটিকে সে স্মরণ করাইতে থাকে, জীবজন্মের আদিতে যে দ্বৈতের সাধনা তাহারি বিরাট বেদনাটিকে ব্যক্তিবিশেষের বিবাহ-ঘটনার উপরে সে পরিব্যাপ্ত করিয়া দেয়।

আমাদের রামায়ণ মহাভারত সুরে গাওয়া হয়, তাহাতে বৈচিত্র্য নাই, তাহা রাগিণী নয়, তাহা সুর মাত্র। আর কিছু নয়, ওটুকুতে কেবল সংসারের সমস্ত তুচ্ছতা, দীনতা এবং বিচ্ছিন্নতার উপরের দিকে একটু ইসারা করিয়া দেয় মাত্র। মহাকাব্যের ভাষাটা যেখানে একটা কাহিনী বলিয়া চলে সুর সেখানে সঙ্গে সঙ্গে কেবল বলিতে থাকে, অহো, অহো, অহো! ক্ষিতি অপে মিশাল করিয়া যে-মূর্ত্তি গড়া তার সঙ্গে তেজ মরুৎ ব্যোমের যে সংযোগ আছে এই খবরটা মনে করাইয়া রাখে।

আমাদের বেদমন্ত্রগানেও ঐরূপ। তার সঙ্গে একটি সরল সুর লাগিয়া থাকে, মহারণ্যের মর্ম্মর-ধ্বনির মত, মহাসমুদ্রের কল-গর্জ্জনের মত। তাহাতে কেবল এই আভাস দিতে থাকে যে এই কথাগুলি এক-দিন দুই দিনের নহে, ইহা অন্তহীন কালের, ইহা মানুষের ক্ষণিক সুখ দুঃখের বাণী নহে, ইহা আত্মার নীরবতারই যেন আত্মগত নিবেদন।



মহাকাব্যের বড় কথাটা যেখানে স্বতই বড়, কাব্যের খাতিরে সুর সেখানে আপনাকে ইঙ্গিত মাত্রে ছোট করিয়া রাখিয়াছে কিন্তু যেখানে আবার সঙ্গীতই মুখ্য সেখানে তার সঙ্গের কথাটি কেবলি বলিতে থাকে আমি কেহই না, আমি কিছুই না ; আমার মহিমা সুরে। এই জন্য হিন্দুস্থানী গানের কথাটা অধিকাংশ স্থলেই যা-খুসি-তাই। এই যে পূরবীর গান—

"লইরে শ্যাম এঁদোরিয়া
ক্যায়সে ধঁরু মেরে শিরো পয় গাগরিয়া।"

এর মানে, শ্যাম আমার জলের কলসী রাখবার "বিড়ে"টা চুরি করিয়াছে। এই তুচ্ছ কথাটাকে এত বড় সুগভীর বেদনার সুরে বাঁধিবা-মাত্র মন বলে, এই যে কলসী এই যে বিড়ে, এ ত সামান্য কলসী সামান্য বিড়ে নয়, এ এমন একটা-কিছু চুরি, যার দাম বলিবার মত ভাষা জগতে নাই, যার হিসাবের অসীম অঙ্কটা কেবল ঐ পূরবীর তানের মধ্যেই পৌঁছে।

কোনো একটা বিশেষ উদ্দীপনা—যেমন যুদ্ধের সময় সৈনিকদের মনকে রণোৎসাহে উত্তেজিত করা—আমাদের সঙ্গীতের ব্যবহারে দেখা যায় না। তার বেলায় তুরী ভেরী দামামা শঙ্খ প্রভৃতির সহযোগে একটা তুমুল কোলাহলের ব্যবস্থা। কেননা আমাদের সঙ্গীত জিনিসটাই ভূমার সুর ; তার বৈরাগ্য, তার শান্তি, তার গম্ভীরতা সমস্ত সঙ্কীর্ণ উত্তেজনাকে নষ্ট করিয়া দিবার জন্যই। এই একই কারণে হাস্যরস আমাদের সঙ্গীতের আপন জিনিস নয়। কেননা বিকৃতিকে লইয়াই বিদ্রূপ। প্রকৃতির ত্রুটিই এই বিকৃতি, সুতরাং তাহা বৃহতের বিরুদ্ধ। শান্ত হাস্য বিশ্বব্যাপী কিন্তু অট্টহাস্য নহে। সমগ্রের সঙ্গে অসামঞ্জস্যই পরিহাসের ভিত্তি। এইজন্যই

আমাদের আধুনিক উত্তেজনার গান কিম্বা হাসির গান স্বভাবতই বিলিতি ছাঁদের হইয়া পড়ে।

বিলিতির সঙ্গে এই দিশি গানের ছাঁদের তফাৎটা কোন্‌খানে? প্রধান তফাৎ সেই অতিসূক্ষ্ম সুরগুলি লইয়া, যাকে বলে শ্রুতি। এই শ্রুতি আমাদের গানের সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্র। ইহারি যোগে এক সুর কেবল যে আরেক সুরের পাশাপাশি থাকে তা নয় তাদের মধ্যে নাড়ির সম্বন্ধ ঘটে। এই নাড়ির সম্বন্ধ ছিন্ন করিলে রাগরাগিণী যদিবা টেঁকে তাদের ছাঁদটা বদল হইয়া যায়। আমাদের হাল ফেশানের কন্সর্টের গৎগুলি তার প্রমাণ। এই গতের সুরগুলি কাটা কাটা হইয়া নৃত্য করিতে থাকে, কিন্তু তাদের মধ্যে সেই বেদনার সম্বন্ধ থাকে না যা লইয়া আমাদের সঙ্গীতের গভীরতা। এই সব কাটা সুরগুলিকে লইয়া নানা প্রকারে খেলানো যায়,—উত্তেজনা বল, উল্লাস বল, পরিহাস বল, মানুষের বিশেষ বিশেষ হৃদয়াবেগ বল, নানা ভাবে তাদের ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু যেখানে রাগ-রাগিণী আপনার সুসম্পূর্ণতার গাম্ভীর্য্যে নির্ব্বিকার ভাবে বিরাজ করিতেছে সেখানে ইহারা লজ্জিত।

স্বর্গলোকের একটা মস্ত সুবিধা কিম্বা অসুবিধা আছে, সেখানে সমস্তই সম্পূর্ণ। এইজন্য দেবতারা কেবলি অমৃত পান করিতেছেন কিন্তু তাঁরা বেকার। মাঝে মাঝে দৈত্যেরা উৎপাত না করিলে তাঁদের অমরত্ব তাঁদের পক্ষে বোঝা হইয়া উঠিত। তাঁদের স্বর্গোদ্যানে তাঁরা ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিতে পারেন কিন্তু সেখানে ফুল গাছের একটা চারাও তাঁরা বদল করিয়া সাজাইতে পারেন না, কেননা সমস্ত সম্পূর্ণ। মর্ত্যলোকে যেখানে অপূর্ণতা সেইখানেই নূতনের সৃষ্টি,



বিশেষের সৃষ্টি, বিচিত্রের সৃষ্টি। আমাদের রাগরাগিণী সেই স্বর্গোদ্যান। ইহা চিরসম্পূর্ণ। এই জন্যই আমাদের রাগরাগিণীর রসটি সাধারণ বিশ্বরস। মেঘমল্লার বিশ্বের বর্ষা, বসন্ত বাহার বিশ্বের বসন্ত। মর্ত্যলোকের দুঃখ সুখের অন্তহীন বৈচিত্র্যকে সে আমল দেয় না।

যে-কোনো তেলেনা লইয়া যদি পরীক্ষা করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব যে, তার সুরগুলিকে কাটা-কাটা রাখিলে একই রাগিণীর দ্বারা নানা প্রকার হৃদয় ভাবের বর্ণনা হইতে পারে। কিন্তু সুরগুলিকে যদি গড়ানে করিয়া পরস্পরের গায়ে হেলাইয়া গাওয়া যায় তা হইলে হৃদয়-ভাবের বিশেষ বৈচিত্র্য লেপিয়া গিয়া রাগিণীর সাধারণ ভাবটা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

এটা কেমনতর? যেমন দেখা গেছে, খুড়তত, জাঠতত, মাসতত, পিসতত প্রভৃতি অসংখ্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পারিবারিক শ্রুতির বাঁধনে যে ছেলেটি অত্যন্ত ঠাসা হইয়া একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া থাকে, সেই ছেলেই বৃহৎ পরিবার হইতে বাহির হইয়া জাহাজের খালাসিগিরি করিয়া নিঃসম্বলে আমেরিকায় গিয়া আজ খুবই শক্ত সমর্থ সজীব সতেজভাবে ধড়ফড় করিয়া বেড়াইতেছে। আগে সে পরিবারের ঠেলা গাড়িতে পূর্ব্বপুরুষের রাস্তায় বাঁধি-বরাদ্দমত হাওয়া খাইত। এখন সে নিজে ঘোড়া হাঁকাইয়া চলে এবং তার রাস্তার সংখ্যা নাই। বাঁধন-ছাড়া সুরগুলো যে-গানকে গড়িয়া তোলে তার খেয়াল নাই সে কোন্ শ্রেণীর, সে এই জানে যে "স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ।"

শুধুমাত্র রসকে ভোগ করা নয় কিন্তু আপনাকে প্রকাশ করা যখন মানুষের অভিপ্রায় হয় তখন সে এই বিশেষত্বের বৈচিত্র্যকে ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ওঠে। তখন সে নিজের আশা

আকাঙ্ক্ষা হাসি কান্না সমস্তকে বিচিত্র রূপ দিয়া আর্টের অমৃতলোক আপন হাতে সৃষ্টি করিতে থাকে। আত্মপ্রকাশের এই সৃষ্টিই স্বাধীনতা। ঈশ্বরের রচিত এই সংসার অসম্পূর্ণ বলিয়া একদল লোক নালিশ করে। কিন্তু যদি অসম্পূর্ণ না হইত তবে আমাদের অধীনতা চিরন্তন হইত। তা হইলে, যা-কিছু আছে তাহাই আমাদের উপর প্রভুত্ব করিত, আমরা তার উপর একটুও হাত চালাইতে পারিতাম না। অস্তিত্বটা গলার শিকল পায়ের বেড়ি হইত। শাসন-তন্ত্র যতই উৎকৃষ্ট হোক্ তার মধ্যে শাসিতের আত্মপ্রকাশের কোনো ফাঁকই যদি কোথাও না থাকে তবে তাহা সোনার দড়িতে চিরউদ্বন্ধন। মহাদেব নারদ এবং ভরত মুনিতে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া যদি আমাদের সঙ্গীতকে এমন চূড়ান্ত উৎকর্ষ দিয়া থাকেন যে আমরা তাকে কেবলমাত্র মানিতেই পারি সৃষ্টি করিতে না পারি তবে এই সুসম্পূর্ণতার দ্বারাই সঙ্গীতের প্রধান উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে।

চৈতন্যের আবির্ভাবে বাংলা দেশে বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে-হিল্লোল তুলিয়াছিল সে একটা শাস্ত্রছাড়া ব্যাপার। তাহাতে মানুষের মুক্তি-পাওয়া চিত্ত ভক্তিরসের আবেগে আত্মপ্রকাশ করিতে ব্যাকুল হইল। সেই অবস্থায় মানুষ কেবল স্থাবরভাবে ভোগ করে না, সচলভাবে সৃষ্টি করে। এইজন্য সেদিন কাব্যে ও সঙ্গীতে বাঙালী আত্মপ্রকাশ করিতে বসিল। তখন পয়ার ত্রিপদীর বাঁধা ছন্দে প্রচলিত বাঁধা কাহিনী পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা আর চলিল না। বাঁধন ভাঙিল—সেই বাঁধন বস্তুত প্রলয় নহে, তাহা সৃষ্টির উদ্যম। আকাশে নীহারিকার যে ব্যাপকতা তার একটা অপরূপ মহিমা আছে। কিন্তু সৃষ্টির



অভিব্যক্তি এই ব্যাপকতায় নহে। প্রত্যেক তারা আপনাতে আপনি স্বতন্ত্র হইয়া নক্ষত্রলোকের বিরাট ঐক্যকে যখন বিচিত্র করিয়া তোলে তখন তাহাতেই সৃষ্টির পরিণতি। বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব কাব্যেই সেই বৈচিত্র্যচেষ্টা প্রথম দেখিতে পাই। সাহিত্যে এইরূপ স্বাতন্ত্র্যের উদ্যমকেই ইংরেজিতে রোম্যাণ্টিক মুভমেণ্ট বলে।

এই স্বাতন্ত্র্যচেষ্টা কেবল কাব্যছন্দের মধ্যে নয়, সঙ্গীতেও দেখা দিল। সেই উদ্যমের মুখে কালোয়াতি গান আর টিঁকিল না। তখন সঙ্গীত এমন সকল সুর খুঁজিতে লাগিল যাহা হৃদয়াবেগের বিশেষত্বগুলিকে প্রকাশ করে, রাগরাগিণীর সাধারণ রূপগুলিকে নয়। তাই সেদিন বৈষ্ণব-ধর্ম্ম শাস্ত্রিক পণ্ডিতের কাছে যেমন অবজ্ঞা পাইয়াছিল, ওস্তাদীর কাছে কীর্ত্তন গানের তেমনিই অনাদর ঘটিয়াছে।

আজ নূতন যুগের সোনার কাঠি আমাদের অলস মনকে ছুঁইয়াছে। কেবল ভোগে আর আমাদের তৃপ্তি নাই, আমাদের আত্মপ্রকাশ চাই। সাহিত্যে তার পরিচয় পাইতেছি। আমাদের নূতন-জাগরুক চিত্রকলাও পুরাতন রীতির আবরণ কাটিয়া আত্মপ্রকাশের বৈচিত্র্যের দিকে উদ্যত। অর্থাৎ স্পষ্টই দেখিতেছি আমরা পৌরাণিক যুগের বেড়ার বাহিরে আসিলাম। আমাদের সামনে এখন জীবনের বিচিত্র পথ উদ্ঘাটিত। নূতন নূতন উদ্ভাবনের মুখে আমরা চলিব। আমাদের সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন চিত্রকলা সবই আজ অচলতার বাঁধন হইতে ছাড় পাইয়াছে। এখন আমাদের সঙ্গীতও যদি এই বিশ্বযাত্রার তালে তাল রাখিয়া না চলে তবে ওর আর উদ্ধার নাই।

হয়ত সেও চলিতে সুরু করিয়াছে। কিছুদূর না এগোলে তার হিসাব পাওয়া যাইবে না। একদিক হইতে দেখিলে মনে হয় যেন

গানের আদর দেশ হইতে চলিয়া গেছে। ছেলেবেলায় কলিকাতায় গাহিয়ে বাজিয়ের ভিড় দেখিয়াছি; এখন একটি খুঁজিয়া মেলা ভার, ওস্তাদ যদি বা জোটে শ্রোতা জোটানো আরো কঠিন। কালোয়াতি বৈঠকে শেষ পর্য্যন্ত সবল অবস্থায় টিঁকিতে পারে এমন ধৈর্য্য ও বীর্য্য একালে দুর্লভ। এটা আক্ষেপের বিষয়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে মিল না রাখিতে পারিলে বড় বড় মজবুৎ জিনিসও ভাঙিয়া পড়ে। এমন কি হাল্‌কা জিনিস শীঘ্র ভাঙে না, ভাঙিবার বেলায় বড় জিনিসই ভাঙে। তাই আমাদের দেশের প্রাচীন স্থাপত্যের পরিচয় ভগ্নাবশেষে। অন্ততঃ তার ধারা আর সচল নাই। অথচ কুঁড়েঘর আগে যেমন করিয়া তৈরি হইত এখনো তেমনি করিয়া হয়। কেননা প্রাচীন স্থাপত্য যে সকল রাজা ও ধনীর বিশেষ প্রয়োজনকে আশ্রয় করিয়াছিল তারাও নাই সেই অবস্থারও বদল হইয়াছে। কিন্তু দেশের যে-জীবনযাত্রা কুঁড়ে ঘরকে অবলম্বন করে তার কোনো বদল হয় নাই।

আমাদের সঙ্গীতও রাজসভা সম্রাট-সভায় পোষ্যপুত্রের মত আদরে বাড়িতেছিল। সে সব সভা গেছে, সেই প্রচুর অবকাশও নাই, তাই সঙ্গীতের সেই যত্ন আদর সেই হৃষ্টপুষ্টতা গেছে। কিন্তু গ্রাম্য-সঙ্গীত, বাউলের গান, এ-সবের মায় নাই। কেননা, ইহারা যে-রসে লালিত সেই জীবনের ধারা চিরদিনই চলিতেছে। আসল কথা, প্রাণের সঙ্গে যোগ না থাকিলে বড় শিল্পও টিঁকিতে পারে না।

কিন্তু আমাদের দেশের বর্ত্তমান কালের জীবন কেবল গ্রাম্য নহে। তার উপরেও আর একটা বৃহৎ লোকস্তর জমিয়া উঠিতেছে যার সঙ্গে বিশ্বপৃথিবীর যোগ ঘটিল। চিরাগত প্রথার খোপখাপের মধ্যে সেই আধুনিক চিত্তকে আর কুলায় না। তাহা নূতন নূতন উপলব্ধির পথ



দিয়া চলিতেছে। আর্টের যে-সকল আদর্শ স্থাবর, তার সঙ্গে এর গতির যোগ রহিল না, বিচ্ছেদ বাড়িতে লাগিল। এখন আমরা দুই যুগের সন্ধিস্থলে। আমাদের জীবনের গতি যে দিকে জীবনের নীতি সম্পূর্ণ সেদিকের মত হয় নাই। দুটোতে ঠোকাঠুকি চলিতেছে। কিন্তু যেটা সচল তারই জিৎ হইবে।

এই যে আমাদের নূতন জীবনের চাঞ্চল্য, গানের মধ্যে ইহার কিছু-কিছু লক্ষণ দেখা দিয়াছে। তাই একদিকে গান-বাজনার পরে অনাদরও যেমন লক্ষ্য করা যায় আরেকদিকে তেমনি আদরও দেখিতেছি। আজকাল ঘরে ঘরে হার্ম্মোনিয়ম, গ্রামোফোন, পাড়ায় পাড়ায় কন্সর্ট। ইহাতে অনেকটা রুচিবিকার দেখা যায়। কিন্তু চিনি জ্বাল দিবার গোড়ার বলকে রসে অনেকটা পরিমাণ গাদ ভাসিয়া ওঠে। সেই গাদ কাটিতে কাটিতেই রস ক্রমে গাঢ় ও নির্ম্মল হইয়া আসে। আজ টগ্‌বগ্ শব্দে সঙ্গীতের সেই গাদ ফুটিতেছে; পাড়ায় টেঁকা দায়। কিন্তু সেটা লইয়া উদ্বিগ্ন হইবার দরকার নাই। সু-খবরটা এই যে চিনির জ্বাল চড়ানো হইয়াছে।

গানবাজনার সম্বন্ধে কালের যে বদল হইয়াছে তার প্রধান লক্ষণ এই যে, আগে যেখানে সঙ্গীত ছিল রাজা, এখন সেখানে গান হইয়াছে সর্দ্দার। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ গান শুনিবার জন্যই এখনকার লোকের আগ্রহ, রাগরাগিণীর জন্য নয়। সেই সকল বিশেষ গানের জন্যই গ্রামোফোনের বাটতি। যুবক মহলে গায়কের আদর সে গান জানে বলিয়া, সে ওস্তাদ বলিয়া নয়।

পূর্ব্বে ছিল দস্তুরের মই দিয়া সমতল করা চষা জমি। এখন তাহা ফুঁড়িয়া নানাবিধ গানের অঙ্কুর দেখা দিতেছে। ওস্তাদের ইচ্ছা ইহা-

দের উপর দিয়া দস্তুরের মই চালায়। কেননা যার প্রাণ আছে তার নানান্ খেয়াল, দস্তুর বুড়োটা নবীন প্রাণের খেয়াল সহিতে পারে না। শাসনকেই সে বড় বলিয়া জানে, প্রাণকে নয়।

কিন্তু সরস্বতীকে শিকল পরাইলে চলিবে না, সে শিকল তাঁরই নিজের বীণার তারে তৈরি হইলেও নয়। কেননা মনের বেগই সংসারে সব চেয়ে বড় বেগ। তাকে ইণ্টার্‌ন্ করিয়া যদি সলিটরি সেল্-এর দেয়ালে বেড়িয়া রাখা যায় তবে তাহাতে নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা হইবে। সংসারে কেবলমাত্র মাঝারির রাজত্বেই এমন সকল নিদারুণতা সম্ভবপর হয়। যারা বড়, যারা ভূমাকে মানে তারা সৃষ্টি করিতেই চায় দমন করিতে চায় না। এই সৃষ্টির ঝঞ্ঝাট বিস্তর, তার বিপদও কম নয়। বড় যারা তারা সেই দায় স্বীকার করিয়াও মানুষকে মুক্তি দিতে চায়, তারা জানে মানুষের পক্ষে সব চেয়ে ভয়ঙ্কর মাঝারির শাসন। এই শাসনে যা-কিছু সবুজ তা হল্‌দে হইয়া যায়, যা কিছু সজীব তা কাঠ হইয়া ওঠে।

এইবার এই বর্ত্তমান আনাড়ি লোকটার অপথযাত্রার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত দুই একটা কথায় বলিয়া লই। কেননা গান সম্বন্ধে আমি যেটুকু সঞ্চয় করিয়াছি তা ঐ অঞ্চল হইতেই। সাহিত্যে লক্ষ্মীছাড়ার দলে ভিড়িয়াছিলাম খুব অল্প বয়সেই। তখন ভদ্র গৃহস্থের কাছে অনেক তাড়া খাইয়াছি। সঙ্গীতেও আমার ব্যবহারে শিষ্টতা ছিল না। তবু সে-মহল হইতে পিঠের উপর বাড়ি যে কম পড়িয়াছে তার কারণ এখনকার কালে সে-দিকটার দেউড়িতে লোকবল বড় নাই।

তবু যত দৌরাত্ম্যই করি না কেন, রাগরাগিণীর এলাকা একেবারে পার হইতে পারি নাই। দেখিলাম তাদের খাঁচাটা এড়ানো চলে কিন্তু



বাসাটা তাদেরই বজায় থাকে। আমার বিশ্বাস এই রকমটাই চলিবে। কেননা আর্টের পায়ের বেড়িটাই দোষের, কিন্তু তার চলার বাঁধা পথটায় তাকে বাঁধে না।

আমার বোধ হয় য়ুরোপীয় সঙ্গীত রচনাতেও সুরগুলি রচয়িতার মনে এক-একটা দল বাঁধিয়া দেখা দেয়। এক-একটি গাছ কতকগুলি জীবকোষের সমবায়। প্রত্যেক কোষ অনেকগুলি পরমাণুর সম্মিলন। কিন্তু পরমাণু দিয়া গাছের বিচার হয় না, কেন না তারা বিশ্বের সামগ্রী, এই কোষগুলিই গাছের।

তেমনি রসের জৈব-রসায়নে কয়েকটি সুর বিশেষভাবে মিলিত হইলে তারাই গানের জীবকোষ হইয়া ওঠে। এই সব দানা-বাঁধা সুরগুলিকে নানা আকারে সাজাইয়া রচয়িতা গান বাঁধেন। তাই য়ুরোপীয় গান শুনিতে শুনিতে যখন অভ্যাস হইয়া আসে তখন তার স্বরসংস্থানের কোষ-গঠনের চেহারাটা দেখিতে পাওয়া সহজ হয়। এই স্বরসংস্থানটা রূঢ়ী নয় ইহা যৌগিক। তবেই দেখা যাইতেছে সকল দেশের গানেই আপনিই কতকগুলি সুরের ঠাট তৈরি হইয়া ওঠে। সেই ঠাটগুলিকে লইয়াই গান তৈরি করিতে হয়।

এই ঠাটগুলির আয়তনের উপরই গান-রচয়িতার স্বাধীনতা নির্ভর করে। রাজমিস্ত্রী ইঁট সাজাইয়া ইমারৎ তৈরি করে। কিন্তু তার হাতে ইঁট না দিয়া যদি এক-একটা আস্ত তৈরি দেয়াল কিম্বা মহল দেওয়া যাইত তবে ইমারৎ গড়ায় তার নিজের বাহাদুরী তেমন বেশী থাকিত না। সুরের ঠাটগুলি ইঁটের মত হইলেই তাদের দিয়া ব্যক্তিগত বিশেষত্ব প্রকাশ করা যায়, দেয়াল কিম্বা আস্ত মহলের মত হইলে তাদের দিয়া জাতিগত সাধারণতাই প্রকাশ করা যায়। আমা-

দের দেশের গানের ঠাট এক-একটা বড় বড় ফালি, তাকেই বলি রাগিণী।

আজ সেই ফালিগুলাকে ভাঙিয়া চুরিয়া সেই উপকরণে নিজের ইচ্ছামত কোঠা গড়িবার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু টুক্‌রাগুলি যতই টুক্‌রা হোক্ তাদের মধ্যে সেই আস্ত জিনিসটার একটা ব্যঞ্জনা আছে। তাদের জুড়িতে গেলে সেই আদিম আদর্শ আপনিই অনেকখানি আসিয়া পড়ে। এই আদর্শকে সম্পূর্ণ কাটাইয়া স্বাধীন হইতে পারি না। কিন্তু স্বাধীনতার পরে যদি লক্ষ্য থাকে তবে এই বাঁধন আমাদিগকে বাধা দিতে পারিবে না। সকল আর্টেই প্রকাশের উপকরণমাত্রই একদিকে উপায় আর-একদিকে বিঘ্ন। সেই সব বিঘ্নকে বাঁচাইয়া চলিতে গিয়া, কখনো তার সঙ্গে লড়াই কখনো বা আপোস করিতে করিতে আর্ট বিশেষভাবে শক্তি, নৈপুণ্য ও সৌন্দর্য্যলাভ করে। যে উপকরণ আমাদের জুটিয়াছে তার অসম্পূর্ণতাকেও খাটাইয়া লইতে হইবে, সেও কাজে লাগিবে।

আমাদের গানের ভাষারূপে এই রাগরাগিণীর টুকরাগুলিকে পাইয়াছি। সুতরাং যে-ভাবেই গান রচনা করি এই রাগরাগিণীর রসটি তার সঙ্গে মিলিয়া থাকিবেই। আমাদের রাগিণীর সেই সাধারণ বিশেষত্বটি কেমন, যেমন আমাদের বাংলা দেশের খোলা আকাশ। এই অবারিত আকাশ আমাদের নদীর সঙ্গে, প্রান্তরের সঙ্গে, তরুচ্ছায়ানিভৃত গ্রামগুলির সঙ্গে নিয়ত লাগিয়া থাকিয়া তাদের সকলকেই বিশেষ একটি ঔদার্য্য দান করিতেছে। যে-দেশে পাহাড়গুলো উঁচু হইয়া আকাশের মধ্যে বাঁধ বাঁধিয়াছে সেখানে পার্ব্বতী প্রকৃতির ভাবখানা আমাদের প্রান্তরবাসিনীর সঙ্গে স্বতন্ত্র। তেমনি



আমাদের দেশের গান যেমন করিয়াই তৈরি হোক্ না কেন, রাগরাগিণী সেই সর্ব্বব্যাপী আকাশের মত তাহাকে একটি বিশেষ নিত্যরস দান করিতে থাকিবে।

একবার যদি আমাদের বাউলের সুরগুলি আলোচনা করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব যে, তাহাতে আমাদের সঙ্গীতের মূল আদর্শটাও বজায় আছে অথচ সেই সুরগুলা স্বাধীন। ক্ষণে ক্ষণে এ-রাগিণী ও-রাগিণীর আভাস পাই কিন্তু ধরিতে পারা যায় না। অনেক কীর্ত্তন ও বাউলের সুর বৈঠকী গানের একেবারে গা ঘেঁষিয়া গিয়াও তাকে স্পর্শ করে না। ওস্তাদের আইন অনুসারে এটা অপরাধ। কিন্তু বাউলের সুর যে একঘরে', রাগরাগিণী যতই চোখ রাঙাক্ সে কিসের কেয়ার করে! এই সুরগুলিকে কোনো রাগকৌলিন্যের জাতের কোঠায় ফেলা যায় না বটে তবু এদের জাতির পরিচয় সম্বন্ধে ভুল হয় না—স্পষ্ট বোঝা যায় এ আমাদের দেশেরই সুর, বিলিতি সুর নয়।

এমনি করিয়া আমাদের আধুনিক সুরগুলি স্বতন্ত্র হইয়া উঠিবে বটে কিন্তু তবুও তারা একটা বড় আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইবে না। তাদের জাত যাইবে বটে কিন্তু জাতি যাইবে না। তারা সচল হইবে, তাদের সাহস বাড়িবে, নানারকম সংযোগের দ্বারা তাদের মধ্যে নানাপ্রকার শক্তি ও সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিবে।

একটা উপমা দিলে কথাটা স্পষ্ট হইবে। আমাদের দেশের বিপুলায়ত পরিবারগুলি আজকাল আর্থিক ও অন্যান্য কারণে ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। সেই টুক্‌রা পরিবারের মানুষগুলির মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বভাবতই বাড়িয়াছে। তবু সেই পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার ভাবটা

আমাদের মন হইতে যায় না। এমন কি, বাহিরের লোকের সঙ্গে ব্যবহারেও এটা ফুটিয়া ওঠে। এইটেই আমাদের বিশেষত্ব। এই বিশেষত্ব লইয়া ঠিকমত ব্যবহার করিতে পারিলে আমাদের জীবনটা টিকটিকির কাটা লেজের মত কিম্বা কন্সর্টের তারস্বর গৎগুলার মত নীরস খাপছাড়া হইবে না, তাহা চারিদিকের সঙ্গে সুসঙ্গত হইবে। তাহা নিজের একটি বিশেষ রসও রাখিবে অথচ স্বাতন্ত্র্যের শক্তিও লাভ করিবে।

একটা প্রশ্ন এখনো আমাদের মনে রহিয়া গেছে তার উত্তর দিতে হইবে। য়ুরোপীয় সঙ্গীতে যে-হার্ম্মনি অর্থাৎ স্বরসঙ্গতি আছে আমাদের সঙ্গীতে তাহা চলিবে কি না। প্রথম ধাক্কাতেই মনে হয়, "না, ওটা আমাদের গানে চলিবে না, ওটা য়ুরোপীয়।" কিন্তু হার্ম্মনি য়ুরোপীয় সঙ্গীতে ব্যবহার হয় বলিয়াই যদি তাকে একান্তভাবে য়ুরোপীয় বলিতে হয়, তবে এ কথাও বলিতে হয়, যে, যে-দেহতত্ত্ব অনুসারে য়ুরোপে অস্ত্র-চিকিৎসা চলে সেটা য়ুরোপীয়, অতএব বাঙালীর দেহে ওটা চালাইতে গেলে ভুল হইবে। হার্ম্মনি যদি দেশবিশেষের সংস্কারগত কৃত্রিম সৃষ্টি হইত তবে ত কথাই ছিল না। কিন্তু যে-হেতু এটা সত্যবস্তু ইহার সম্বন্ধে দেশকালের নিষেধ নাই। ইহার অভাবে আমাদের সঙ্গীতের যে অসম্পূর্ণতা সেটা যদি অস্বীকার করি তবে তাহাতে কেবলমাত্র কণ্ঠের জোর বা দস্তের জোর প্রকাশ পাইবে।

তবে কিনা ইহাও নিশ্চিত যে, আমাদের গানে হার্ম্মনি ব্যবহার করিতে হইলে তার ছাঁদ স্বতন্ত্র হইবে। অন্তত মূল সুরকে সে যদি ঠেলিয়া চলিতে চায় তবে সেটা তার পক্ষে আস্পর্দ্ধা হইবে। আমাদের দেশে ঐ বড় সুরটা চিরদিন ফাঁকায় থাকিয়া চারিদিকে খুব করিয়া ডালপালা মেলিয়াছে। তার সেই স্বভাবকে ক্লিষ্ট করিলে তাকে মারা হইবে। শীতদেশের মত অত্যন্ত ঘন ভিড় আমাদের ধাতে সয় না। অতএব আমাদের গানের পিছনে যদি স্বরানুচর নিযুক্ত থাকে তবে দেখিতে হইবে তারা যেন পদে পদে আলো হাওয়া না আটকায়।



বসিয়া যে থাকে তার সাজসজ্জা প্রচুর ভারি হইলেও চলে, কিন্তু চলাফেরা করিতে হইলে বোঝা হাল্কা করা চাই। লোকসান না করিয়া হাল্কা করিবার ভালো উপায় বোঝাটাকে ভাগ করিয়া দেওয়া। আমাদের গানের বিপুল তান-কর্ত্তব ঐ হার্ম্মনি বিভাগে চালান করিয়া দিলে মূল গানটার সহজ স্বরূপ ও গাম্ভীর্য্য রক্ষা পায় অথচ তার গতিপথ খোলা থাকে। এক হাতে রাজদণ্ড, অন্য হাতে রাজছত্র, কাঁধে জয়ধ্বজা এবং মাথায় সিংহাসন বহিয়া রাজাকে যদি চলিতে হয় তবে তাহাতে বাহাদুরী প্রকাশ পায় বটে কিন্তু তার চেয়ে শোভন ও সুসঙ্গত হয় যদি এই আসবাবগুলি নানাস্থানে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। তাতে সমারোহ বাড়ে বই কমে না। আমাদের গানের যদি অনুচর বরাদ্দ হয় তবে সঙ্গীতের অনেক ভারী ভারী মালপত্র ঐদিকে চালান করিয়া দিতে পারি। যাইহোক্ আমাদের সঙ্গীতের পক্ষে এই একটা বড় মহল ফাঁকা আছে এটা যদি দখল করিতে পারি তবে এইদিকে অনেক পরীক্ষা ও উদ্ভাবনার জায়গা পাইব। যৌবনের স্বভাবসিদ্ধ সাহস যাঁদের আছে এবং লক্ষ্মীছাড়ার ক্ষ্যাপা হাওয়া যাঁদের গায়ে লাগিল এই একটি আবিষ্কারের দুর্গমক্ষেত্র তাঁদের সামনে পড়িয়া। আজ হোক্ কাল হোক্ এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই লোক নামিবে।

সঙ্গীতের একটা প্রধান অঙ্গ তাল। আমাদের আসরে সবচেয়ে বড় দাঙ্গা এই তাল লইয়া। গান বাজনার ঘোড়দৌড়ে গান জেতে কি তাল জেতে এই লইয়া বিষম মাতামাতি। দেবতা যখন সজাগ না থাকেন তখন অপদেবতার উৎপাত এমনি করিয়াই বাড়িয়া ওঠে। স্বয়ং সঙ্গীত যখন পরবশ, তখন তাল বলে আমাকে দেখ, সুর বলে আমাকে। কেননা দুই ওস্তাদে দুই বিভাগ দখল করিয়াছে—দুই মধ্যস্থের মধ্যে ঠেলাঠেলি—কর্ত্তৃত্বের আসন কে পায়—মাঝে হইতে সঙ্গীতের মধ্যে আত্মবিরোধ ঘটে।

তাল জিনিসটা সঙ্গীতের হিসাব-বিভাগ। এর দরকার খুবই বেশী সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু দরকারের চেয়েও কড়াক্কড়িটা যখন বড় হয় তখন দরকারটাই মাটি হইতে থাকে। তবু আমাদের দেশে এই বাধাটাকে অত্যন্ত বড় করিতে হইয়াছে কেননা মাঝারির হাতে কর্ত্তৃত্ব। গান সম্বন্ধে ওস্তাদ অত্যন্ত বেশী ছাড়া পাইয়াছে, এইজন্য সঙ্গে সঙ্গে আরেক ওস্তাদ যদি তাকে ঠেকাইয়া না চলে তবে ত সে নাস্তানাবুদ্ করিতে পারে। কর্ত্তা যেখানে নিজের কাজের ভার নিজেই লন সেখানে হিসাব খুব বেশী কড়া হয় না। কিন্তু নায়েব যেখানে তাঁর হইয়া কাজ করে সেখানে কানাকড়িটার চুল-চেরা হিসাব দাখিল করিতে হয়। সেখানে কণ্ট্রোলার আপিস কেবলি খিটিখিটি করে এবং কাজ চালাইবার আপিস বেজার হইয়া ওঠে।

য়ুরোপীয় গানে স্বয়ং রচয়িতার ইচ্ছামত মাঝে মাঝে তালে ঢিল পড়ে এবং প্রত্যেকবারেই সমের কাছে গানকে আপন তালের হিসাব-নিকাশ করিয়া হাঁফ ছাড়িতে হয় না। কেননা সমস্ত সঙ্গীতের প্রয়োজন বুঝিয়া রচয়িতা নিজে তার সীমানা বাঁধিয়া দেন, কোনো



মধ্যস্থ আসিয়া রাতারাতি সেটাকে বদল করিতে পারে না। ইহাতেই সুরেতালে রেষারেষি বন্ধ হইয়া যায়। য়ুরোপীয় সঙ্গীতে তালের বোলটা মৃদঙ্গের মধ্যে নাই, তাহা হার্ম্মনি বিভাগে গানের অন্তরঙ্গ রূপেই একাসনে বিরাজ করে। লাঠিয়ালের হাতে রাজদণ্ড দিলেও সে তাহা লইয়া লাঠিয়ালি করিতে চায়, কেননা রাজত্ব করা তার প্রকৃতিগত নয়। তাই ওস্তাদের হাতে সঙ্গীত সুরতালের কৌশল হইয়া উঠে। এই কৌশলই কলার শত্রু। কেননা কলার বিকাশ সামঞ্জস্যে, কৌশলের বিকাশ দ্বন্দ্বে।

অনেক দিন হইতেই কবিতা লিখিতেছি, এইজন্য, যতই বিনয় করি না কেন, এটুকু না বলিয়া পারি না যে, ছন্দের তত্ত্ব কিছু কিছু বুঝি। সেই ছন্দের বোধ লইয়া যখন গান লিখিতে বসিলাম, তখন চাঁদ সদাগরের উপর মনসার যে রকম আক্রোশ, আমার রচনার উপর তালের দেবতা তেমনি ফোঁস করিয়া উঠিলেন। আমার জানা ছিল ছন্দের মধ্যে যে-নিয়ম আছে তাহা বিধাতার গড়া নিয়ম, তা কামারের গড়া নিগড় নয়। সুতরাং তার সংযমে সঙ্কীর্ণ করে না, তাহাতে বৈচিত্র্যকে উদ্ঘাটিত করিতে থাকে। সেই কথা মনে রাখিয়া বাংলা কাব্যে ছন্দকে বিচিত্র করিতে সঙ্কোচ বোধ করি নাই।

কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানে তালের সেই কাজ। অতএব ছন্দ যে-নিয়মে কবিতায় চলে তাল সেই নিয়মে গানে চলিবে এই ভরসা করিয়া গান বাঁধিতে চাহিলাম। তাহাতে কি উৎপাত ঘটিল একটা দৃষ্টান্ত দিই। মনে করা যাক্ আমার গানের কথাটি এই ঃ—

কাঁপিছে দেহলতা থরথর,
চোখের জলে আঁখি ভরভর।

দোদুল তমালেরি বনছায়া
তোমার নীলবাসে নিল কায়া,
বাদল নিশীথেরি ঝরঝর
তোমার আঁখি পরে ভরভর।
যে কথা ছিল তব মনে মনে
চমকে অধরের কোণে কোণে।
নীরব হিয়া তব দিল ভরি
কি মায়া-স্বপনে যে, মরি মরি,
নিবিড় কাননের মরমর
বাদল নিশীথের ঝরঝর।

এ ছন্দে আমার পাঠকেরা কিছু আপত্তি করিলেন না। তাই সাহস করিয়া ঐটেই ঐ ছন্দেই সুরে গাহিলাম। তখন দেখি যাঁরা কাব্যের বৈঠকে দিব্য খুসী ছিলেন তাঁরাই গানের বৈঠকে রক্তচক্ষু। তাঁরা বলেন, এ-ছন্দের এক অংশে সাত আর-এক অংশে চার ইহাতে কিছুতেই তাল মেলে না। আমার জবাব এই, তাল যদি না মেলে সেটা তালেরই দোষ। ছন্দটাতে দোষ হয় নাই কেন তাহা বলি। এই ছন্দ তিন এবং চার মাত্রার যোগে তৈরি। এইজন্যই "তোমার নীলবাসে" এই সাত মাত্রার পর "নিল কায়া" এই চার মাত্রা খাপ খাইল। তিন মাত্রা হইলেও ক্ষতি হইত না—যেমন, "তোমার নীলবাসে মিলিল।" কিন্তু ইহার মধ্যে ছয় মাত্রা কিছুতেই সইবে না। যেমন, "তোমারি নীলবাসে ধরিল শরীর।" অথচ প্রথম অংশে যদি ছয়ের ভাগ থাকিত তবে দিব্য চলিত, যেমন, "তোমার সুনীল বাসে ধরিল শরীর।" এ আমি বলিতেছি কানের স্বাভাবিক



রুচির কথা। এই কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিবার পথ। অতএব এই কানের কাছে যদি ছাড় মেলে তবে ওস্তাদকে কেন ডরাইব?

আমার দৃষ্টান্তগত ছন্দটিতে প্রত্যেক লাইনেই সবশুদ্ধ ১১ মাত্রা আছে। কিন্তু এমন ছন্দ হইতে পারে যার প্রত্যেক লাইনে সমান মাত্রা বিভাগ নাই। যেমন:—

বাজিবে, সখি, বাঁশি বাজিবে,
হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে।
বচন রাশি রাশি কোথা যে যাবে ভাসি
অধরে লাজহাসি সাজিবে।
নয়নে আখিজল করিবে ছলছল
সুখবেদনা মনে বাজিবে।
মরমে মুরছিয়া মিলাতে চাবে হিয়া
সেই চরণযুগ-রাজীবে।

ইহার প্রথম দুই লাইনে মাত্রা ভাগ ৩+৪+৩=১০। তৃতীয় লাইনে ৩+৪+৩+৩+৪+৩=১৪। আমার মতে এই বৈচিত্র্যে ছন্দের মিষ্টতা বাড়ে। অতএব উৎসাহ করিয়া গান ধরিলাম। কিন্তু এক ফের ফিরিতেই তালওয়ালা পথ আটক করিয়া বসিল। সে বলিল, "আমার সমের মাশুল চুকাইয়া দাও!" আমি ত বলি এটা বেআইনি আবোয়াব। কান মহারাজার উচ্চ আদালতে দরবার করিয়া খালাস পাই। কিন্তু সেই দরবারের বাহিরে খাড়া আছে মাঝারি শাসনতন্ত্রের দারোগা। সে খপ্ করিয়া হাত চাপিয়া ধরে, নিজের বিশেষ বিধি খাটায়, রাজার দোহাই মানে না।

কবিতায় যেটা ছন্দ, সঙ্গীতে সেইটেই লয়। এই লয় জিনিসটি সৃষ্টি ব্যাপিয়া আছে; আকাশের তারা হইতে পতঙ্গের পাখা পর্য্যন্ত সমস্তই ইহাকে মানে বলিয়াই বিশ্বসংসার এমন করিয়া চলিতেছে অথচ ভাঙিয়া পড়িতেছে না। অতএব কাব্যেই কি গানেই কি এই লয়কে যদি মানি তবে তালের সঙ্গে বিবাদ ঘটিলেও ভয় করিবার প্রয়োজন নাই।

একটি দৃষ্টান্ত দিই:—

ব্যাকুল বকুলের ফুলে
ভ্রমর মরে পথ ভুলে।
আকাশে কি গোপন বাণী
বাতাসে করে কানাকানি,
বনের অঞ্চল খানি
পুলকে উঠে দুলে দুলে।
বেদনা সুমধুর হয়ে
ভুবনে গেল আজি বয়ে।
বাঁশিতে মায়া তান পূরি
কে আজি মন করে চুরি,
নিখিল তাই মরে ঘুরি
বিরহ সাগরের কূলে।

এটা যে কি তাল তা আমি আনাড়ি জানি না। এবং কোনো ওস্তাদও জানেন না। গণিয়া দেখিলে দেখি প্রত্যেক লাইনে নয় মাত্রা। যদি এমন বলা যায় যে, না হয় নয় মাত্রায় একটা নূতন



তালের সৃষ্টি করা যাক্ তবে আর একটা নয় মাত্রার গান পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্—

যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে
সে কাঁদনে সেও কাঁদিল।
যে বাঁধনে মোরে বাঁধিছে
সে বাঁধনে তারে বাঁধিল।
পথে পথে তারে খুঁজিনু
মনে মনে তারে পূজিনু,
সে পূজার মাঝে লুকায়ে
আমারেও সে যে সাধিল।
এসেছিল মন হরিতে
মহা পারাবার পারায়ে
ফিরিল না আর তরীতে
আপনারে গেল হারায়ে।
তারি আপনার মাধুরী
আপনারে করে চাতুরী,
ধরিবে কি ধরা দিবে সে
কি ভাবিয়া ফাঁদ ফাঁদিল॥

এও নয় মাত্রা কিন্তু এর ছন্দ আলাদা। প্রথমটার লয় ছিল তিনে ছয়ে, দ্বিতীয়টার লয় ছয়ে তিনে। আরো একটা নয়ের তাল দেখা যাক্:—

আঁধার রজনী পোহাল
জগৎ পূরিল পুলকে
বিমল প্রভাত কিরণে
মিলিল দ্যুলোকে ভূলোকে।

নয় মাত্রা বটে কিন্তু এ ছন্দ স্বতন্ত্র। ইহার লয় তিন তিন তিনে। ইহাকে কোন্ নাম দিবে? আরো একটা দেখা যাক্।

দুয়ার মম পথ পাশে
সদাই তারে খুলে রাখি।
কখন তার রথ আসে
ব্যাকুল হয়ে জাগে আঁখি॥
শ্রাবণ শুনি দূর মেঘে
লাগায় গুরু গরগর,
ফাগুন শুনি বায়ুবেগে
জাগায় মৃদু মরমর,
আমার বুকে উঠে জেগে
চমক তারি থাকি থাকি।
কখন্ তার রথ আসে
ব্যাকুল হয়ে জাগে আঁখি॥
সবাই দেখি যায় চলে
পিছন পানে নাহি চেয়ে
উতল রোলে কল্লোলে
পথের গান গেয়ে গেয়ে।



শরৎ মেঘ ভেসে ভেসে
উধাও হয়ে যায় দূরে,
যেথায় সব পথ মেশে
গোপন কোন্ সুরপুরে,—
স্বপনে ওড়ে কোন্ দেশে
উদাস মোর প্রাণ পাখী!
কখন্ তার রথ আসে
ব্যাকুল হয়ে জাগে আঁখি।

এও ত আরেক ছন্দ। ইহার লয় পাঁচে চারে মিলিয়া। আবার এইটেকে উল্টাইয়া দিয়া চারে পাঁচে করিলে ন'য়ের ছন্দকে লইয়া নয় ছয় করা যাইতে পারে। চৌতাল ত বারো মাত্রার ছন্দ। কিন্তু এই বারো মাত্রা রক্ষা করিলেও চৌতালকে রক্ষা করা যায় না এমন হয়। এই ত বারো মাত্রা:—

বনের পথে পথে বাজিছে বায়ে
নূপুর রুনুরুনু কাহার পায়ে!
কাটিয়া যায় বেলা মনের ভুলে,
বাতাস উদাসিছে আকুল চুলে,
ভ্রমর মুখরিত বকুল ছায়ে
নূপুর রুনুরুনু কাহার পায়ে।

ইহা চৌতালও নহে, একতালাও নহে, ধামারও নয়, ঝাঁপতালও নয়। লয়ের হিসাব দিলেও তালের হিসাব মেলে না। তালওয়ালা সেই গরমিল লইয়া কবিকে দায়িক করে।

কিন্তু হাল আমলে এ সমস্ত উৎপাৎ চলিবে না। আমরা শাসন মানিব, তাই বলিয়া অত্যাচার মানিব না। কেননা যে-নিয়ম সত্য সে-নিয়ম বাহিরের জিনিস নয়, তাহা বিশ্বের বলিয়াই তাহা আমার আপনার। যে-নিয়ম ওস্তাদের তাহা আমার ভিতরে নাই, বাহিরে আছে; সুতরাং তাকে অভ্যাস করিয়া বা ভয় করিয়া বা দায়ে পড়িয়া মানিতে হয়। এইরূপ মানার দ্বারাই শক্তির বিকাশ বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের সঙ্গীতকে এই মানা হইতে মুক্তি দিলে তবেই তার স্বভাব তার স্বরূপকে নব নব উদ্ভাবনার ভিতর দিয়া ব্যক্ত করিতে থাকিবে।

এই ত গেল সঙ্গীতের আভ্যন্তরিক উপদ্রব। আবার বাহিরে একদল বলবান লোক আছেন তাঁরা সঙ্গীতকে দ্বীপান্তরে চালান করিতে পারিলে সুস্থ থাকেন। শ্যামের বাঁশির উপর রাগ করিয়া রাধিকা যেমন বাঁশবনটাকে একেবারে ঝাড়ে-মূলে উপাড়িতে চাহিয়া ছিলেন ইঁহাদের সেই রকম ভাব। মাটির উপর পড়িলে গায়ে ধূলা লাগে বলিয়া পৃথিবীটাকে বরখাস্ত করিতে ইঁহারা কখনই সাহস করেন না কিন্তু গানকে ইঁহারা বর্জ্জন করিবার প্রস্তাব করেন এই সাহসে যে, তাঁরা মনে করেন, গানটা বাহুল্য, ওটা না হইলেও কাজ চলে এবং পেট ভরে। এটা বোঝেন না যে, বাহুল্য লইয়াই মনুষ্যত্ব, বাহুল্যই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য। সত্যের পরিণাম সত্যে নহে, আনন্দে। আনন্দ সত্যের সেই অসীম বাহুল্য যাহাতে আত্মা আপনাকেই আপনি প্রকাশ করে;—কেবল আপনার উপকরণকে নয়। যদি কোন সভ্যতার বিচার করিতে হয় তবে এই বাহুল্য দিয়াই তার পরিমাপ। কেজো লোকেরা সঞ্চয় করে। সঞ্চয়ে প্রকাশ নাই, কেননা প্রকাশ ত্যাগে। সেই ত্যাগের সম্পদই বাহুল্য।



সঞ্চয় করাও নহে, ভোগ করাও নহে, কিন্তু আপনাকে প্রকাশ করিবার যে প্রেরণা, তাহাতেই আপনার বিকাশ। গান যদি কেবল বৈঠকখানার ভোগ বিলাস হয় তবে তাহাতে নির্জ্জীবতা প্রমাণ করে। প্রকাশের যত রকম ভাষা আছে সমস্তই মানুষের হাতে দিতে হইবে। কেননা যে পরিমাণে মানুষ বোবা সেই পরিমাণে সে দুর্ব্বল, সে অসম্পূর্ণ। এই জন্য ওস্তাদের গড়খাই-করা গানকে আমাদের সকলের করা চাই। তাহা হইলে জীবনের ক্ষেত্রে গানও বড় হইবে, সেই গানের সম্পদে জীবনও বড় হইবে।

এতদিন আমাদের ভদ্রসমাজ গানকে ভয় করিয়া আসিতেছিল। তার কারণ, যা সকলের জিনিস, ভোগী তাকে বাঁধ দিয়া আপনার করাতেই তার স্রোত মরিয়াছে, সে দূষিত হইয়াছে। ঘরের বদ্ধ বাতাস যদি বিকৃত হয় তবে দরজা জানালা খুলিয়া দিয়া বাহিরের বাতাসের সঙ্গে তার যোগসাধন করা চাই। ইহাতে ভয় করিবার কারণ নাই, কেননা ইহাতে বাড়িটাকে হারানো হয় না। আজকালকার দেশাভিমানীরা ঐ ভুল করেন। তাঁরা মনে করেন দরজা জানালা খুলিয়া দিয়া বাহিরকে পাওয়াটাই আপনার বাড়িকে হারানো। যেন, যে-হাওয়া চৌদ্দ-পুরুষের নিশ্বাসে বিষিয়া উঠিয়াছে তাহাই আমার নিজের হাওয়া, আর ঐ বিশ্বের হাওয়াটাই বিদেশী। এ কথা ভুলিয়া যান ঘরের হাওয়ার সঙ্গে বাহিরের হাওয়ার যোগ যেখানে নাই, সেখানে ঘরই নাই সেখানে কারাগার।

দেশের সকল শক্তিই আজ জরাসন্ধের কারাগারে বাঁধা পড়িয়াছে। তারা আছে মাত্র তারা চলে না—দস্তুরের বেড়িতে তারা বাঁধা। সেই জরার দুর্গ ভাঙিয়া আমাদের সমস্ত বন্দী শক্তিকে বিশ্বে ছাড়া

দিতে হইবে। তা সে কি গানে, কি সাহিত্যে, কি চিন্তায়, কি কর্ম্মে, কি রাষ্ট্র, কি সমাজে! এই ছাড়া-দেওয়াকে যারা ক্ষতি-হওয়া মনে করে তারাই কৃপণ, তারাই আপনার সম্পদ হইতে আপনি বঞ্চিত, তারাই অন্নপূর্ণার অন্নভাণ্ডারে বসিয়া উপবাসী। যারা শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখে তারাই হারায়, যারা মুক্তির ক্ষেত্রে ছাড়িয়া রাখে তারাই রাখে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# স্বামী-স্ত্রী।

—:০:—

শাস্ত্র আর দেশাচারের সমবেত চেষ্টা এবং নিশ্চেষ্টতার ফলে আমাদের সমাজে স্ত্রী-জাতির মানসিক গতি ও পরিণতি যে ধারা অনুসরণ করে চলেছে—তাতে আমরা সবাই খুব খুসী, এবং ঘরে বাইরে তা নিয়ে সময়ে অসময়ে যথেষ্ট গর্ব্ব প্রকাশ করতেও অল্প বিস্তর ব্যগ্র। ব্যাপারটাকে তর্কের অতীত করে', পদ্যের ছাঁদে বেঁধে আমরা বলে' থাকি,—

"রূপবতী সাধ্বী সতী ভারত-ললনা,
কোথা দিতে তাদের তুলনা?"

উপরের চরণের "রূপবতী" কথাটাকে "চ-বৈ-তু-হি"র দলে ছেড়ে দিলে আশা করি কারো বিরাগ-ভাজন হবার আশঙ্কা নেই। আর, তাহলে বাকী যা রইল তার মানে দাঁড়াল এই যে—সাধুতা আর সতীত্বে ভারত-ললনা জগতে অতুলনীয়া। কিছুদিন আগেও যে দেশে ধরে বেঁধে "সতী" করবার প্রথা প্রচলিত ছিল, সে দেশের পক্ষে এমন ধারা দাবী একেবারে অসঙ্গত বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না! পাতিব্রত্য যে হিন্দুরমণীর পক্ষে একটা জাতিগত সংস্কার এবং জন্মগত উত্তরাধিকার, সে কথা মেনে নিয়েই আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করছি।

তবে, এ সব বিষয়ে, আমাদের সমাজের সঙ্গে বিভিন্ন সমাজের তুলনা অনেকটা বকের বাড়ীতে শেয়ালের নিমন্ত্রণের মতই অশোভন ব্যাপার বলে আমার মনে হয়। আমাদের ভূতপূর্ব্ব শাস্ত্রকারগণের অতিমাত্র শৃঙ্খলা-প্রিয়তার ফলে সমাজে স্ত্রী-জাতির পক্ষে কার্য্যতঃ যে লক্ষ্য এবং সাধনা সেকালে নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল, তা বহুকাল ধরে আমাদের "সনাতন জড়তার" ভিতর দিয়ে পরিশ্রুত হয়ে এখন যে আকার লাভ করেছে সেটা অপর সকল সভ্যসমাজ থেকে ভিন্ন রকমের!

"সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভালো" মনে করে' আমরা ধীরে ধীরে আমাদের স্ত্রী-জাতিকে "স্ত্রী"র জাতিতে পরিণত করেছি! স্ত্রীত্বেই তাদের মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ; বর্ণমালার অনুস্বর বিসর্গের মত সদাই তারা আশ্রয়-স্থানভাগী; কোনো রকম স্বাতন্ত্র্যই তাদের প্রাপ্য এবং গ্রাহ্য নয়—এ কথা নানান্ রকমে তাদের শুনিয়েছি, পড়িয়েছি,—শিখিয়েছি, বুঝিয়েছি। আমাদের স্ত্রী-জাতিকে আমরা দেখি—বর্ত্তমান আর ভবিষ্যতের পুরুষ-জাতির মধ্যে যোজকের মত। ব্যাপারটাকে তর্কের সময়ে যতই আমরা আধ্যাত্মিক আভায় এবং সামাজিক সম্ভ্রমে ভূষিত করি না কেন, সে গৌরব অনুভব ও উপভোগ করবার মত মার্জ্জনা এবং স্বাধীনতা সাধারণতঃ আমাদের সমাজে স্ত্রী-জাতির থাকে না।

শিশুকালে বর্ণসংযোগের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা কণ্ঠস্থ করি—"স্বামী পরম গুরু", "বন্ধ্যা নারীর আদর নাই"!—এ রকম সব দাম্পত্য এবং পারিবারিক সত্য ও সিদ্ধান্ত প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সাথে শিশু-হৃদয়ে মুদ্রিত করবার প্রথা আর কোনো দেশেই নেই।



তারপর শৈশব অতিক্রম করতে না করতেই রূপকথা, ব্রতকথা ও উপকথার উপদ্রবে নারী-জীবনের গণ্ডী ক্রমশঃ আমাদের কাছে সংহত এবং সুনির্দ্দিষ্ট হতে থাকে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী-জাতির মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের প্রশ্নেরও সমাধি হয়—"হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা" দিয়ে!

এম্নি করে' নারীজাতির মনুষ্যত্বের বিনিময়ে আমরা স্ত্রীত্বের বনিয়াদ্ পাকা করি! এ যেন প্রাণ দিয়ে চোখ বাঁচানো। পাতিব্রত্য অতি উপাদেয় পদার্থ তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু মনুষ্যত্ব তার চেয়ে ঢের বেশী মহার্হ। যে স্ত্রীত্বের মূলে রয়েছে অপূর্ণ মনুষ্যত্ব,—যা মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বয়োগুণে স্ত্রী-হৃদয়ে স্বভাবতঃই ফুটে ওঠে নি,—পারিপার্শ্বিক প্রেরণা এবং অপ্রাকৃত উত্তেজনার ফলে গোটা মনুষ্যত্বই যেখানে বিকৃত এবং সংহত হয়ে স্ত্রীত্বে পরিণত হয়েছে সেখানে তা নিয়ে ঢাক ঢোল পেটানো বুদ্ধিমানের কাজ বলে ত মনে হয় না।—তরকারী হিসেবে বাঁধা কপি উপাদেয় হলেও গাছ হিসেবে সে যে অতি বিশ্রী!

আমাদের সমাজের আত্মবিস্মৃত স্ত্রী-জাতির এই তথাকথিত পাতিব্রত্যে ব্যক্তিগত অথবা সামাজিক জীবনের কোনো মহৎ কল্যাণই সাধিত হবার সম্ভাবনা নেই! অভিজ্ঞতার উপরে যা প্রতিষ্ঠিত নয়, ঘাত প্রতিঘাতে যার মেরুদণ্ড শক্ত হবার অবসর পায় নি, প্রতি পদে শাস্ত্র আর দেশাচারের উপর ভর দিয়েই তার জান্ বাঁচাতে হবে। নিজের চোখ যার ফুটতে পায় নি—শাস্ত্রের চোখে দেশাচারের চস্মা এঁটেই তাকে সব দেখতে হবে! রজ্জুকেও তার সর্প জ্ঞান করে তফাৎ থাকতে হবে—নৈলে সর্পে রজ্জুভ্রম হবার

আশঙ্কা! দুগ্ধপোষ্য মামাশ্বশুরকে দেখলে ঘোম্‌টার আয়তন তার বাড়াতে হবে; আর বাপের বয়সী ভাসুরের ছায়া স্পর্শ করলে "তেরাত্র" তাকে উপবাস কর্‌তে হবে! এই তার পক্ষে বিধি।

নন্দলাল বহুকষ্টে কিছুদিন তার ভীষণ পণ রক্ষা কর্‌তে পেরেছিল বটে, কিন্তু তার বাড়া নিশ্চয়ই আর বিশেষ কিছুই করে উঠতে পারে নি। আমাদের দেশের স্ত্রী-সমাজও শাস্ত্র আর দেশাচারের কল কৌশলে মরে বেঁচে পত্নীত্ব বাঁচিয়ে চলে বটে, কিন্তু তাতে "পতি নারায়ণ" ছাড়া আর কোনো দেবতাই প্রসন্ন হন না। "পতি-নারায়ণ"কে অযথা অবজ্ঞা করতে আমি বলিনে, কিন্তু তারি মোহে "সত্যনারায়ণের" প্রসাদ উপেক্ষা করলে—বিনি তুফানেও ঘাটে এসে ভরাডুবি হয় সে কথা ত "পাঁচালী"তেই লেখা রয়েছে! সাধারণ ভাবে সেই কথাটার আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধেরও উদ্দেশ্য।

( ২ )

দাম্পত্যদায়িত্বে যে কর্ত্তব্যবিভাগ সাধারণতঃ আমাদের সমাজে দেখা যায়, সেটা কি সমাজ তত্ত্ব কি মনস্তত্ত্ব কোনো দিক দিয়েই সমর্থন করা চলে না। নিরুপায় স্ত্রীর স্কন্ধে সমস্ত নৈতিক দায়িত্বটা নিঃশেষে চাপিয়ে স্বামীর হাতে দেওয়া হয়েছে আর্থিক দায়িত্ব, আর সার্ব্বভৌমিক অধিকার। আমাদের সমাজে স্বামীদের নৈতিক দায়িত্বজ্ঞান নেই—এমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়; তবে তার অনুশীলন এবং সম্পাদন হচ্ছে স্বামীর খুসী—অর্থাৎ optional—এই কথাই আমি বিশেষ করে' বল্‌তে চাই। এ কথা আর্থিক দায়িত্ব সম্বন্ধেও বলা



চলে। স্বামী উপার্জ্জনে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক হ'লে সমাজে কিছুই বলার থাকে না (স্ত্রীর ত' থাক্‌তেই নেই সে কথায়)।—খেয়াল হ'লেই স্বামী "সংসার" ত্যাগ করে' কোনো "আশ্রম" বা "আড্ডায়" ভিড়ে যেতে পারেন—আর তাতে সমাজের বাহবাও অনেক স্থলে তাঁর জুটে থাকে! কিন্তু স্ত্রীর বেলায় পান থেকে চূণটুকু খস্‌লেই প্রলয়! যে পথের কথা তার কাছে বাৎলে দেওয়া হয়েছে, তা' কাদাজলে যতই পিছল, আর কাঁটাবনে যতই দুর্গম হোক না প্রাণের দায়ে তা' থেকে একটু এদিক-ওদিক হলেই তাকে যেতে হবে একেবারে রসাতল!

জামাতা বাবাজিকে আশীর্ব্বচন লিখ্‌তে আমরা "নিরাপদ্ দীর্ঘ-জীবেষু"র চাইতে বেশী কিছু লেখা বাহুল্য এবং অনাবশ্যক মনে করি; কিন্তু বধূমাতার বেলায় "সাবিত্রী সমতুল্যাসু"র কমে কিছুতেই চলে না। কেবল আশীর্ব্বচন লিখ্‌বার বেলাতেই যে এমন ধারা পক্ষপাত তা নয়; দুর্ব্বচন প্রয়োগের সময়েও আদান প্রদানটা এই অনুপাতেই হয়ে থাকে! সে কালে নাকি যে পাপে শূদ্রের প্রাণদণ্ড বা নাসাকর্ণচ্ছেদের ব্যবস্থা হ'তো ঠিক সেই পাপের দরুণই ব্রাহ্মণের নামমাত্র অর্থদণ্ডই যথেষ্ট বিবেচিত হ'তো! একালে আমাদের স্ত্রী-পুরুষের সামাজিক দণ্ডও এই আইনেরই ধারা অনুসরণ করে' চলে। শাদা এবং স্বল্প কথায় বল্‌তে গেলে আমাদের সমাজে স্বামীর অপরাধের দণ্ড নেই,—আর স্ত্রীর দোষের মার্জ্জনা নেই! শুধু তাই নয়; অনেক সময়ে স্বামীর দোষে স্ত্রীই অবমানিত হয়। স্বামী-স্ত্রীতে একাত্মবোধ আর কোনো সমাজেই এতটা ঘনীভূত হ'তে পারে নি!—এ কথা অবশ্য স্বীকার কর্‌তেই হবে।

সত্যবানের মত যজ্ঞনিষ্ঠ, অথবা পুণ্যশ্লোক নলের মত সত্যব্রত না হয়েই আমরা সাবিত্রী দময়ন্তীর কামনা করে' থাকি!—কাযেই, শাস্ত্রে

যে বলে—কাম থেকে ক্রোধের উৎপত্তি—তার প্রমাণ আমরা অহরহই ঘরে ঘরে দেখ্‌তে পাই। হরধনু-ভঙ্গের শক্তি অনেক কাল হ'লই অন্তর্হিত হয়েছে সমাজ থেকে, কিন্তু সীতা-লাভের সখ্‌ পূরামাত্রাতেই বর্ত্তমান! সখের নেশায় আমরা একেবারেই ভুলে যাই যে—এ ঘোর কলিতে ভূঁই ফুঁড়ে সীতার আবির্ভাবের কোনই সম্ভাবনা নেই! আর তা' থাক্‌লেও তাঁকে শিক্ষিত এবং দীক্ষিত কর্‌বার মত জনক কোথায়? ত্রেতায় যখন সমাজে ত্রিপাদ পূণ্য আর এক পাদ মাত্র পাপ ছিল, তখনও জনক মাত্র একজনই জন্মে ছিলেন!—আর, এখন এই ঘোর কলিতে যদি আমরা সকলেই নিজ নিজ শ্বশুর বাড়ীকে মিথিলাপুরী বলে' অনুমান করে' বসি,—তা' হ'লে বাকী সবও উক্তরূপ অনুমান দিয়েই উপভোগ কর্‌তে হবে!—প্রত্যক্ষ কর্‌তে চাইলেই নেশার স্বপন ছুটে যাবে।

মোটের উপর কথা হচ্ছে এই যে, স্ত্রীর পাতিব্রত্য সহজ, সার্থক এবং কল্যাণকর কর্‌তে হ'লে স্বামীর মনুষ্যত্ব আগে জাগাতে হবে। সংযম এবং শিক্ষার অভাবে যেখানে পুরুষ ক্রমেই অপাত্রে পরিণত হচ্ছে, সেখানে স্ত্রী-জাতির উপর কঠোর বিধানের ব্যবস্থা কর্‌লে কেবল তাদের মনুষ্যত্বই পঙ্গু হবে; আর সমাজের ঘরের আবর্জ্জনা আঙ্গিনায় এসে জড়ো হবে।

স্ত্রীকে "দেবী" করে' তুল্‌বার জন্যে আমাদের সমাজে যেমন ধারা ধরাধরি, বাঁধাবাঁধি, কষাকষি চলেছে, এর সিকির সিকি আয়োজনও যদি স্বামীকে দেবতা করে' তুলবার জন্যে নিয়োজিত হ'তো, তা' হ'লে বরং আমাদের সামাজিক শৃঙ্খলা কতকটা সহজ এবং স্বাভাবিক হ'তো,—আর আমরাও হয়ত এমন ধারা অমানুষ হতাম না। কিন্তু তা হয় নি!



একচোখো সামাজিক অনুশাসনে আমাদের স্বামীসম্প্রদায় ক্রমেই দুঃশাসন হয়ে' উঠেছে, আর স্ত্রীসমাজ জীবন্মৃত হয়ে' পড়েছে!—অর্থাৎ এক কথায় তাঁরা হয়েছেন "নরমের যম", আর এঁরা হয়েছেন "শক্তের ভক্ত"। এম্নি করে নরমকে নুইয়ে আমরা সমাজকে শৃঙ্খলিত করেছি!

স্মৃতি-সংহিতা সঙ্কলনের ঢের আগে, মানব-সমাজের অতি প্রারম্ভে, যখন মানুষে আর বাঘভালুকে প্রকারগত বিশেষ কোনই পার্থক্য ছিল না—সামাজিক শৃঙ্খলার এই সহজ সিদ্ধান্তটী তখন মানুষ আবিষ্কার করেছিল। তারপরে, সভ্যতার বিস্তৃতি এবং উন্নতির সাথে সাথে স্বামী সম্প্রদায়ের এই স্বেচ্ছাতন্ত্র-শাসন-প্রণালী ক্রমশঃ সংস্কৃত হয়ে আস্‌ছে। বর্ত্তমান সময়ে কোন্ সমাজ কত উন্নত,—সে সমাজের স্ত্রী-জাতির অবস্থাই তার অন্যতম মাপকাঠি। পুঁথি পুরাণ থেকে 'অনুষ্টুপ্ ছন্দের শ্লোক উদ্ধার করে', এ মাপকাঠির ব্যবহার আমরাও দরকার হ'লে করে থাকি। কিন্তু কর্‌লে হবে কি! পাঁজিতে অগাধ জলের কথা লেখা থাক্‌লেও তা' নিংড়ালে এক বিন্দুও পাওয়া যায় না। অনুষ্টুপ্ ছন্দে হাজার বছর আগে যা' লেখা হয়েছিল—এতদিন ধরে' আমাদের "সনাতন জড়তা" এবং জাতীয় দুর্দ্দশার কয়লা বালির ভিতর দিয়ে চুইয়ে এখন সোজা বাংলায় যে আকারে তা' বেরিয়ে এসেছে, তা নিয়ে আর গর্ব্ব কর্‌বার কিছুই নেই!

( ৩ )

অনুতপ্ত নগেন্দ্রনাথের মুখে বঙ্কিম বাবু এই স্বগত উক্তিটী দিয়েছেন ঃ—

"সূর্য্যমুখী কি কেবল আমার স্ত্রী? সূর্য্যমুখী আমার—সব। সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী। আমার সূর্য্যমুখী—কাহার এমন ছিল? সংসারে সহায়, গৃহে লক্ষ্মী, হৃদয়ে ধর্ম্ম, কণ্ঠে অলঙ্কার! আমার নয়নের তারা, হৃদয়ের শোণিত, দেহের জীবন, জীবনের সর্ব্বস্ব! আমার প্রমোদে হর্ষ, বিপদে শান্তি, চিন্তায় বুদ্ধি, কার্য্যে উৎসাহ! আর এমন সংসারে কি আছে? আমার দর্শনে আলোক, শ্রবণে সঙ্গীত, নিশ্বাসে বায়ু, স্পর্শে জগৎ! আমার বর্ত্তমানের সুখ, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের আশা, পরলোকের পুণ্য!"

রোহিণীকে হত্যা করবার আগে গোবিন্দলালও ভ্রমর সম্বন্ধে অনেকটা এই ধরণের মতই ব্যক্ত করেছিলেন। তবে, তখন সময়টা খুব ভালো না থাকাতে, আর উক্তিটীও একেবারে স্বগত ছিল না বলে' ব্যাপারটা স্বভাবতঃই এর চেয়ে একটু সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। এ দুটী জায়গা পড়লেই আমার মনে হয়—"এত যদি সুখ তোমার কপালে, তবে কেন তোমার কাঁথা বগলে?" বস্তুতঃ আমাদের দেশে কাঁথা বগলে না আসা পর্য্যন্ত এ সব কথা ভাব্‌বার অবসর কোনো স্বামীরই হয় না—কারণ "পুড়্‌বে নারী উড়্‌বে ছাই, তবে নারীর গুণ গাই"—এই হচ্ছে আমাদের দেশাচার।

ও সব কথা যাক্। এখন আমি একটু গোলে পড়েছি ঐ "কেবল স্ত্রী" কথাটী নিয়ে। নগেন্দ্রনাথের কথায়—"সূর্য্যমুখী কেবল তাঁর স্ত্রীর ছিলেন না তিনি—সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে



বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী"—এ সব ছিলেন! এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যাঁরা "সম্বন্ধে স্ত্রী" এবং "কেবল স্ত্রী" সংসারে এসে কি তাঁরা করেন? আর, যা' করেন—সেই কি তাঁদের দুর্লভ মনুষ্য জীবনের পক্ষে চরম এবং পরম কর্ত্তব্য? নগেন্দ্রনাথের কথার ভাবে বোধ হয়, আমাদের সমাজের অধিকাংশ স্ত্রীই "কেবল-স্ত্রী"। আমার মনে হয়, সূর্য্যমুখীর চরিত্র বিশ্লেষণ কর্‌লেও দেখা যাবে,—তাঁর ভিতরেও "কেবল স্ত্রী"রই প্রাধান্য ছিল—"অধিকন্তু স্ত্রীর" উপরে। তাঁর যে পলায়ন, সেটা নির্জ্জিত "অধিকন্তু স্ত্রার" প'রে বিজয়ী "কেবল স্ত্রী"র নির্ব্বাসন দণ্ড।

যথার্থই যদি তিনি নগেন্দ্রনাথের পক্ষে স্নেহে মাতা, পরামর্শে শিক্ষক, চিন্তায় বুদ্ধি—এ সব হতেন তাহলে নগেন্দ্রনাথের সংসার-প্রাঙ্গনের বিষ-বীজ অঙ্কুরিত হবার অবসর পেতো না! বিরহ-বিধুর নগেন্দ্রনাথ যে কথা বলেছেন—সংসারী নগেন্দ্রনাথ তেমন করে কখনো ভাবেন নি! সূর্য্যমুখী যদি সত্যিই তাঁর "চিন্তার বুদ্ধি" হবে, তবে কুন্দসম্বন্ধীয় অমনধারা সর্ব্বনেশে বুদ্ধি তিনি কোথায় পেলেন? তিনি যদি সত্যিই সূর্য্যমুখীকে "স্নেহে মাতা" "পরামর্শে শিক্ষক" বলে ভাবতে পারতেন—তাহলে আর রূপের নেশা দমনের জন্যে তাঁকে মদের নেশার আশ্রয় নিতে হবে কেন?

বস্তুতঃ, শিক্ষিত এবং সাধারণ রকমের ধর্ম্মভীরু লোকে প্রলোভনের ভিতরে পড়লে গোল্লায় যাবার আগে যতটুকু ইতস্তত করে থাকে, গোবিন্দলাল বা নগেন্দ্রনাথ কেউই তার চেয়ে বড় বেশী কিছু করেন নি। এমন যে দেবীপ্রতিমা, প্রণয়শালিনী, পতিব্রতা, সদাহিতাকাঙ্ক্ষিনী স্ত্রী-রত্ন, তা তাঁদের এ সঙ্কট সময়ে কোনোই কাজে

আসে নি! (আমার খুব দৃঢ় বিশ্বাস,—এঁদের গৃহিণীরা যদি ভ্রমর সূর্য্যমুখী ছাঁচের না হয়ে উগ্রচণ্ডা-ক্ষেমঙ্করী ধাঁচের হতেন, তাহলে এত সব গোলমাল কিছুই হতো না।)

এর কারণ কি? আমাদের সমাজে সুশীলা সাধ্বী স্ত্রীরা প্রায়ই স্বামীর নৈতিক অধঃপতন ঠেকিয়ে রাখতে পারেন না কেন? অনেকেই ত বউএর পরামর্শে ভাই ছাড়েন, মা ছাড়েন—কিন্তু কই; এমন ত শুনিনে,—কেউ কখনো স্ত্রীর চোখের জলে মদ ছেড়েছেন! এর কারণ বেশ স্পষ্ট। যে সব স্ত্রী স্বামীকে কুপরামর্শ দেয়, তাঁরা রূঢ় অর্থে যতই সতী হোক না—পতিগতপ্রাণা তাঁরা নয়। তাদের চিন্তাগত একটী স্বাতন্ত্র্য আছে—আর সেটী মন্দের দিকে! কাজেই তারা সেই স্বাতন্ত্র্যের ঝোঁকে, মন্দের টানে স্বচ্ছন্দে স্বামীকে নিজের পথে টেনে আনে! কিন্তু আমাদের পতিপ্রাণা স্ত্রীদের ত স্বামী থেকে স্বতন্ত্র সত্তা থাকতে নেই। স্বামীকে "ভালো" করবার স্পর্দ্ধা তাঁরা মনেও আনেন না! নীরবে চোখের জল ফেলা ছাড়া পতনোন্মুখ স্বামীর উদ্ধার কল্পে আর কোনো উপায়ই ত তাঁরা জানেন না! যে স্বামী লক্ষ্মীরূপা স্ত্রীর মনে কষ্ট দিয়ে রূপের নেশায় পাগল হতে পারে, সতীর চোখের জলের মর্য্যাদা সে বুঝবে কেমন করে? কাজেই, স্ত্রী যখন বলেন মদ ছাড়তে, তাঁরা তখন জবাব দেন—"সূর্য্যমুখী, আমি মাতাল, মাতালকে শ্রদ্ধা হয়, আমাকে শ্রদ্ধা করিও, নচেৎ আবশ্যক করে না।" কেবল মদ বলে নয় সব বিষয়েই আমাদের স্বামীদের এই এক বাঁধা জবাব! এ জবাবের নির্লজ্জতা এবং হীনতা তলিয়ে বুঝবার মত সুস্থ এবং স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের স্বামীদের মন নেই—মাছের পক্ষে জল এবং পাখীর পক্ষে বাতাস যেমন সহজ-



প্রাপ্য, আমাদের সমাজে স্বামীর পক্ষেও সাধ্বী স্ত্রীর ঐকান্তিক নির্ভর এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা তেম্নি অনায়াস-লভ্য। কাজেই যে নাকি "ছাড়ালেও ছাড়বে না" তাকে দিনের মধ্যে দু' শ' বার "দূর করে" দিতে আর আপত্তি কি? যার আনুগত্য এত বেশী তার আধিপত্যে আর আশঙ্কা কি?

সমাজে এমন হয় কিনা জানিনে; কিন্তু গিরীশ বাবুর সামাজিক নাটক "গৃহলক্ষ্মীতে" এমনও দেখেছি পতিপ্রাণা সতী স্বামীর জন্যে নিজগৃহে বারবণিতা আনবার অনুরোধ কচ্ছেন—স্বামীর কাছে! আবার ধর্ম্মমূলক বিল্বমঙ্গলে অতিথিপরায়ণ 'বণিক' নিজ স্ত্রীকে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ অতিথির তুষ্টি সাধনে অনুরোধ করেছেন—সাধ্বী স্বামীর কথা ঠেল্‌তে না পেরে তাতেও সম্মত! এমন সকল আদুরে পতি আর আষাঢ়ে সতীর সৃষ্টি আমাদের দেশের মাটীতে, আর আমাদের সমাজের নাটকেতেই সম্ভব!

( ৪ )

"বালিকা বধূ" আর "কিশোরী প্রিয়া" পরম রমণীয় পদার্থ,—তাতে হয়ত কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সংসারচক্রে Lubricating oil-এর বদলে লক্ষ্মীবিলাস খুব বেশী দিন কার্য্যকরী হয় না! কাঁচামিঠে আম্র পাকলে পান্‌সে হয়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশী! আমাদের সমাজে প্রথম মিলন সময়ে বয়সের তারতম্য খুব বেশী থাকাতে স্বামী স্ত্রীর বুদ্ধি বিবেচনার মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান থেকে যায়। এ ব্যবধান সবদিক থেকে মিটিয়ে নেবার জন্যে কোনো

তরফ থেকেই বিশেষ কোনো চেষ্টার প্রয়োজন হয় না! পৃথিবীর আর আর সব সভ্যসমাজে স্বামী-স্ত্রীর ভিতরে সহৃদয়তা না থাক্‌লে তাদের সংসার চলে না। কিন্তু আমাদের সমাজে স্বামী-স্ত্রীর কাজ কর্ম্ম, চেষ্টা চরিত্র, এমন করে কেটে ছেঁটে ভাগ যোগ করে দেওয়া হয়েছে যে, যার যার মতন নিজ নিজ কক্ষায় থেকেও তারা বছরের পর বছর সংসারমণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করে পারিবারিক এবং সামাজিক কর্ত্তব্য শেষ করতে পারে। তাদের পরস্পরের বৈষয়িক মতামতের সংঘাত বা অপঘাতের কোনই সম্ভাবনা ঘটে না! "বুড়ি পরম বৈষ্ণব আর বুড়ো বেজায় শাক্ত" হওয়া সত্ত্বেও তারা "দুজনাতে মনের মিলে (!) সুখে" থাকতে পারে।

আমাদের সমাজে স্বামী-স্ত্রীর ভিতরে সহৃদয়তার একান্ত অভাব এমন কথা বলা মোটেই আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি কেবল বল্‌তে চাই, আমাদের সাংসারিক শৃঙ্খলার পক্ষে সেটা অত্যাবশ্যক বা অপরিহার্য্য নয় বলে' অনেক স্থলেই সজ্ঞানে তা সম্পূর্ণ অবজ্ঞাত না হ'লেও অজ্ঞানে তা কতকটা উপেক্ষিত হয়। তারি ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা সর্ব্বাঙ্গীন সহানুভূতি, একটা নিবিড় মিলন এবং পরিপূর্ণ সমবেদনা প্রায়ই ঘটে ওঠে না। আমাদের চোখে যে মিলন খুব প্রগাঢ় বলে' প্রতীয়মান হয়, সেখানেও বুদ্ধি-বৈষম্যের একটা চোরা ফাঁক লুকোনো থাকে! শতসহস্র কাল্পনিক মিলনের মধ্যেও এই সত্যিকারের বিচ্ছেদটা চাপা পড়ে মারা যায় না। তবে সংস্কার এবং অভ্যাসের বশে—সর্ব্বোপরি, আমাদের সাংসারিক জীবনের একঘেয়েমির দরুণ—আমাদের অনেকের কাছেই তা' ধরাপড়বার সম্ভাবনা নেই—একথা আমি স্বীকার করি।



এই বৈষম্যের ফলেই আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যেখামে যত মিল, সেখানে তত গোঁজামিলন! আঘাত পেলেই তা' চটে বেরিয়ে পড়ে! বঙ্কিম বাবু "বিষবৃক্ষ" আর "কৃষ্ণ কান্তের উইলে"—আঘাতের পর আঘাত দিয়ে নগেন্দ্রনাথ আর গোবিন্দলালের মনের এই সব গোঁজা-গুঁজি, জোড়াতালি বাইরে এনে সমাজের সামনে ধরেছেন। রবিবাবুও "ঘরে বাইরে"তে ঠিক তাই করেছেন বিমলা সম্বন্ধে। সমাজ হয় ত তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। মানুষের মন ছিল তাঁদের লক্ষ্য, সমাজ উপলক্ষ মাত্র। কিন্তু তাতে কি? মানুষের মন ত সমাজের আওতাতেই বেড়ে ওঠে! কাজেই, কবির সৃষ্টিকে সার্থক এবং স্বাভাবিক করতে, তাঁকে, বাধ্য হয়েই মানুষের মনের সাথে সাথে সমাজের পরিণতির রহস্য উদ্‌ঘাটিত করতে হয়েছে। কবির কথাকে কাজের সাথে খতিয়ে দেখাই জীবিত সমাজের কর্ত্তব্য! আমাদেরও তাই করতে হবে।

সামাজিক বিধিব্যবস্থার অসম্পূর্ণতা অসঙ্গতি সব সমাজেই আছে, কোনো সমাজেই তা' দূর করবার জন্যে কথা ও কেতাবের অভাব নেই! কিন্তু আমাদের মত আলোচনাবিমুখ এবং সমালোচনাঅসহিষ্ণু সমাজ খুব কমই দেখ্‌তে পাওয়া যায়! আমরা "কৃষ্ণ কান্তের উইল" পড়ে' ভ্রমরের "চেলির বহর দেখে ভাল বল্‌ব কি মন্দ বল্‌ব বুঝে উঠ্‌তে পারিনে; আর বিষবৃক্ষ পড়ে' সূর্য্যমুখীর "বারানসীর" বাহার দেখে অবাক হই। ফলে,—আজ পর্য্যন্ত আমরা ঠিক করে' উঠ্‌তে পারি নি, আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের অঙ্গে কি মানায়! পাঠক রেলে ষ্টীমারে, সভা-সমিতিতে ক্রিয়াকর্ম্মে, সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা আমার এ কথার সত্যতার প্রমাণ পেয়ে থাকেন!

শ্রাবণ ১৩২৪। শ্রীবরদা চরণ গুপ্ত।

# 'অচলায়তন'।

—*—

'অচলায়তন'খানি যেদিন ভূমিষ্ঠ হ'য়ে দশজনের চোখে পড়্‌ল সেদিন সে সঞ্চার করে' গিয়েছিল—প্রবীণের মনে মনে বিরাগ আর নবীনের বুকে বুকে পুলক। এর অবশ্য কারণও ছিল। সেটা হচ্ছে এই যে এই 'অচলায়তন' খানিতে প্রবীণদের আরামে আঘাত কর্‌বার একটা চেষ্টা আছে কিন্তু নবীনদের আনন্দে ব্যাঘাত ঘটাবার কোন ব্যবস্থা নেই। তবে অবশ্য এ কথাটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার যে সকল দেশেই সকল সময়েই প্রবীণদের মধ্যেও অনেক নবীন লুকিয়ে থাকেন আবার নবীনদের মধ্যেও অনেক প্রবীণ জন্ম নেন।

'অচলায়তন' রবীন্দ্রনাথের একখানি নাটক। কিন্তু আমরা নাটক বল্‌লে যা বুঝি—শেক্‌স্‌পীয়ার কালিদাস বল্‌লে যা বুঝি—এমন কি, মেটারলিঙ্ক্‌ ইব্‌সেন্‌ বল্‌লেও যা বুঝি এখানি ঠিক তা' নয়। প্রথমতঃ চোখে-পড়া এর বিশেষত্ব এই যে এতে কোন স্ত্রী-চরিত্র নেই আর দ্বিতীয়তঃ মনে-লাগা বিশেষত্ব এই যে এতে পুরুষেরও যে চরিত্র-গুলো আছে তা মানুষের চরিত্র বল্‌লে সম্পূর্ণ ঠিক হবে না। সে-গুলো যেন মানুষনামক ভগবানের যে সৃষ্ট জীবটী তারই বিভিন্ন বিভিন্ন ভাব—এক একটা দেহ অবলম্বন করে' ফুটে উঠেছে। মানুষের 'চরিত্রে' আর 'ভাবে' প্রভেদ এই যে—চরিত্রটা মানুষের বাহিরের কিন্তু ভাব জিনিসটা তার অন্তরের। মানুষের চরিত্র হচ্ছে



সেইটে যেটা ফুটে ওঠে যখন সে অপরের সংস্পর্শে আসে, অপরের সঙ্গে ব্যবহার করে—কিন্তু ভাব তার ভিতরের বস্তু আপনার সত্তাতেই যার অস্তিত্ব। ইংরেজিতে বলা যেতে পারে যে প্রথমটা হচ্ছে মানুষের objective experience আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে subjective experience, সেই জন্যেই আমরা এই অচলায়তনের পুরুষগুলোকে মানুষের 'চরিত্র' বল্‌তে নারাজ—এরা যেন মানুষের বিভিন্ন বিভিন্ন 'ভাব'। পঞ্চক, মহাপঞ্চক, আচার্য্য অদীনপুণ্য, দর্ভ-কেরা, শোণপাংশুদল এরা যেন সবাই, মানুষের মর্ম্মতলে তার জীবন-দেবতা বসে নিশিদিন যে বীণা বাজাচ্ছে, সেই বীণার এক-একটী সুর; বড় জোর এক একখানি গান—আর এদের কাছে যেটা বহির্জগৎ তারও অর্থ তাদের ওই নিজের নিজের গানের অর্থে। আর তাই পঞ্চকে মহাপঞ্চকে এত প্রভেদ—বিরোধ বল্‌লেও হয়। কিন্তু জীবন-দেবতা জানে যে এ প্রভেদ বিরোধ নয়—বরং ঠিক তার উল্টো। এরা মানুষের জীবনে পরস্পর পরস্পরকে সম্পূর্ণ করেই চলেছে। জীবন-দেবতা জানে সে কথা। এই জীবন-দেবতা হচ্ছে দাদাঠাকুর। আর তাই দাদাঠাকুর "একলা হাজার মানুষ" আবার "মজার মানুষ"ও বটে—তাই দাদাঠাকুর "কোণের মানুষ" আবার "সব মিলনে মেলার মানুষ"ও বটে। কারণ মানুষের জীবন-দেবতা অনন্ত গুণের দেবতা। সেখানে অনন্ত রঙের আলোতে অনন্ত রাগিণী উঠছে—বিরামহীন রাগের মূর্চ্ছনায় বিচিত্র বিচিত্র ছবি ফুটছে। ক্ষুদ্র, মহৎ, বন্ধন, মুক্তি, হাসি, অশ্রু, করুণ রুদ্র—সব সত্য হয়ে রয়েছে সেখানে—আনন্দময় হয়ে রয়েছে সেখানে। তাই দাদা-ঠাকুর যখন অচলায়তনের দেয়াল ভেঙ্গে সেখানে নতুন করে সবায়

আবার প্রাচীর গড়তে আদেশ করলেন তখন সেখান থেকে বাদ দিলেন না কাউকেও—সেখানে সবাই রইল—পঞ্চকও মহাপঞ্চকও—যে দুজন চিরকাল অচলায়তনে পরস্পর পরস্পরের পথে বাধা হয়েই কাটিয়ে এসেছে।

( ২ )

এই বইখানিতে একটা বিষয় আছে যেটা সম্বন্ধে কারও ভুল করবার কোনই সম্ভাবনা নেই সেটা হচ্ছে এই যে—এর আসল লোক হচ্ছে পঞ্চক। এই পঞ্চক কে? অচলায়তনের সবাই যদি জীবন-দেবতার বীণার এক একটী সুর হয়—তবে তার মধ্যে প্রথম সুরটী—প্রধান সুরটী হচ্ছে পঞ্চক। পঞ্চকের ঐ সুর আছে বলে' আর সকল সুরেরও ফুটে ওঠা সম্ভব হয়েছে। পঞ্চকের ঐ সুর থামিয়ে দিলে আর সকল সুরও একে একে থেমে যাবে। এ সুর হচ্ছে মানুষের সেই অতি পুরাতন অতি সনাতন মুক্তির সুর—এ জগতে ছাড়া-পাওয়ার সুর।

সেই অতি পুরাতন অতি সনাতন মানুষ—যে মানুষ চায় প্রকাশ—চায় অনন্ত রাগিণীর মাঝে বিচিত্র আলোকের মাঝে ছন্দে ছন্দে তালে তালে প্রতি পলে পলে ফুটে উঠতে,—আপনাকে এ বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে, বিলিয়ে দিতে। যেমন করে গাছ আপনার ডালপালা ছড়িয়ে দেয়, যেমন করে ফুলটী আপনার সৌরভ বিলিয়ে দেয়—তেমনি করে ছড়িয়ে দিতে বিলিয়ে দিতে। কিন্তু কেন? কোন্ প্রয়োজন সাধনের জন্য? কোন প্রয়োজন সাধনের জন্য নয়। প্রয়োজন যদি



কিছু থাকে তবে সেটা ভীষণ রকমের গৌণ। এ ছড়িয়ে দেওয়ার "কেন"র উত্তর হচ্ছে—আনন্দ। এই ছড়িয়ে দেওয়া, এই প্রকাশ হওয়াতে মানুষের আনন্দ আছে তাই—আবার মানুষের আনন্দ আছে তাই এই ছড়িয়ে দেওয়াই, প্রকাশ হওয়া। এ'কে আশ্রয় করে মানুষ যে প্রতিদিন মনে করে যে সে তার প্রয়োজন সাধন করে' নিচ্ছে, সেটা তার পাটোয়ারী বুদ্ধির মাপকাঠি। কিন্তু মানুষের সম্বন্ধে, সমস্ত সৃষ্টির সম্বন্ধে যেটা খাঁটি নিছক সত্য সেটা হচ্ছে ঐ আনন্দের খেলা। এই আনন্দকে বুকে করে', এই আনন্দময় জগতে মানুষ ক্ষুদ্র অন্ধকার কুঠুরীতে চোখ বুঁজে চিরকাল বসে থাকতে পারে না। সে যে চায় আলো, সে যে চায় বাতাস। সে যে চায় অন্তরের সঙ্গে বাহিরের মিলন—বাহিরের সঙ্গে অন্তরের মিলন। সে চায় হৃদয়ের রঙে বিশ্বটা রঙিয়ে তুলতে—বিশ্বের রঙে হৃদয়টা পূর্ণ করতে। আর এই হচ্ছে পঞ্চক—এই হচ্ছে মানুষ। আর এইটে হচ্ছে "অচলায়তনের" মূল কথা।

কিন্তু এই যে পঞ্চক—এই যে মানুষ—এই যে তার জীবন-দেবতার প্রেরণা—যে প্রেরণার বলে আবহমানকাল হ'তে বিশ্বমানবের অন্তরে

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়,
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তি স্বাদ

সত্য হ'য়ে ফুটে আছে—তা সার্থক করবার পক্ষে মস্ত বাধা পঞ্চককে ঘিরে আছে অচলায়তনের আকাশ-জোড়া প্রাচীর; আর তার মনের চারপাশে ঘিরে আছে পঞ্চাশ হাজার বছরের রাশীকৃত পুঁথি আর তার

সংখ্যাহীন শ্লোক। পঞ্চকের ঘরের চারপাশে যে প্রাচীর তা যত বড়-বড় পাথর দিয়েই গড়া হোক্ না কেন—যত উঁচু করেই গাঁথা হোক্ না কেন—তা ফুৎকারে কোথায় উড়ে যেত—বালার্কের স্পর্শে নীহার-স্তূপের মত মুহূর্ত্তে কোথায় মিলিয়ে যেত যদি না থাক্‌ত তার মনের চারপাশে ঐ অসংখ্য পুঁথি আর তার সংখ্যাবিহীন শ্লোক। অন্তর-দেবতার যে সত্যিকার বন্ধন তা অচলায়তনের প্রাচীরে নেই—তা আছে, পুঁথির "কাকচঞ্চু পরীক্ষায়," "দ্বাবিংশ পিশাচভয়ভঞ্জনে।" এই অচলায়তনে বিধির চাইতে নিষেধ বেশী—কারণ এখানে সাহসের চাইতে ভয় বেশী। যেখানে প্রতি পদে বাধা মান্‌তে হবে—প্রতি মুহূর্ত্তে ভয় করে' পা ফেল্‌তে হবে—সেখানে মানুষ হ'য়ে ওঠে অমানুষ, দুনিয়া হ'য়ে ওঠে অসুখের জায়গা। সেখানে অচলায়তনের উঁচু প্রাচীর খাড়া করে' বাহিরটাকে চিরকাল বাহিরে রাখাই ভাল—সেখানে জীবনটাকে গ্রন্থির পর গ্রন্থি লাগিয়ে কসে' বেঁধে রাখাই হয়ত সুবিধার কথা, কিন্তু মানুষের জীবন-দেবতার সার্থকতা সেখানে মিল্‌বে না কিছুতেই—পঞ্চকের সেখানে হাহাকার—মানুষের সেখানে জীবন্মৃত্যু।

পঞ্চকের সেখানে চির-হাহাকার। সে যে রাশীকৃত পুঁথির চাপে আপনার জীবন-দেবতাকে ঢাকতে পারেনি—পঞ্চাশ হাজার শ্লোকের কল কল কলরোলের মাঝে আপনার জীবন-দেবতার সত্যিকার কথাটী ডুবিয়ে দিতে পারে নি। তার জীবন-দেবতা যে নিশিদিন তার অন্তরে অন্তরে অভিমানের সুরে ডাক্‌ছে—"পঞ্চক" "পঞ্চক"। হায়! এ ডাক ত অচলায়তনের আর কেউ শোনে নি।

তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে
কেউ তা জানে না,



আমার মন যে কাঁদে আপন মনে
কেউ তা মানে না।
ফিরি আমি উদাস প্রাণে,
তাকাই সবার মুখের পানে,
তোমার মতন এমন টানে
কেউ ত টানে না।

না, এমন করে' আর কেউ টানে না পঞ্চককে—যেমন করে' টান্‌ছে তার অন্তরের জীবন-দেবতা—কেউ না—পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে' ছাপ্পান্ন হাজার পুরুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছে যে পুঁথিগুলো, যে শ্লোকগুলো, যে ক্রিয়াগুলো, যে আচারগুলো—সে-গুলো ত নয়ই। জীবন-দেবতার ডাকে পঞ্চক পাগল—বসন্তাগমে রুদ্ধকণ্ঠ কোকিলের আকুলতার মতো তার আকুলতা—ছায়ায় বর্দ্ধিত কুসুমলতার আলোর দিকে ধাওয়ার মতো তার ব্যাকুলতা—কোথায় পড়ে রইল তার "তট তট তোতয় তোতয়"—তার "ধ্বজাগ্রকেয়ূরী" "চক্রেশমন্ত্র"—সেই অচলায়তনে সেই আলোঢাকা বাতাস বন্ধকরা প্রাচীরের মাঝে পঞ্চকের গলা চিরে গান বেরিয়ে এল—

বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর,
কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর,
বাহির হ'তে দুয়ারে কর
কেউ ত হানে না।

এ যে আশ্চর্য্য ব্যাপার! এ যে অচলায়তনের বিরুদ্ধে মানুষের জাজ্বল্যমান বিদ্রোহের সূচনা! অচলায়তনের প্রতিষ্ঠা হওয়া থেকে এ ব্যাপার কেউ দেখে নি, কেউ শোনে নি, কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি।

কতশ যুগ কে জানে তার পেষণেও মানুষের জীবন-দেবতা সরল না! সে আজও অচলায়তনে জন্মে অচলায়তনে মানুষ হ'য়ে ছুটে বেরুতে চায়—আপনার আনন্দে—বিশ্বের মাঝে—খোলা আকাশের তলে! না, জীবন-দেবতা মরে নি—মর্‌তে পারে না। ভগবান তেমন কাঁচা শিল্পী নন। পঞ্চকের অন্তরে অন্তরে জীবন-দেবতার জয় হয়েছে। বাহিরেও তার জয় হবে নিশ্চয়। সেদিন বুঝি "অচলায়তনের" প্রাচীরের একটী পাথরও খাড়া হ'য়ে থাক্‌বে না।

( ৩ )

ঐ যে শোণপাংশুরা—যারা খেঁসারি ডালেরও চাষ করে আবার লোহাও পেটে, যারা নাপিত ক্ষৌর কর্‌তে কর্‌তে বাঁ গালে রক্ত পাড়িয়ে দিলে উল্টে নাপিতের গালে চড় কসিয়ে দেয়, আবার খেয়া নৌকয় উঠতেও তারা সেদিন কোনই ভয় করে না—অথচ এ সত্ত্বেও যারা একেবারে জাতকে-জাত অধঃপাতে যায় নি—সমস্ত সৃষ্টির সঙ্গে তাদের এমনি একটা সহজ স্বাভাবিক প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধ আছে যে, তাদের বাড়ীর উত্তর দিকে একজটাদেবীও ভয় দেখাবার জন্যে বসে' থাকে না কিম্বা কারও গায়ের উপর হাঁই তুললেও তাদের আয়ু কমে যায় না। তারা হয়ত বাড়ীর উত্তর দিকটায় দিব্যি চাষ করে, সেখানে খেঁসারি ডালের বীজ বুনে দেয়—একজটাদেবীর একগাছি চুলও সেখান থেকে বেরয় না—বেরয় যা সেটা চমৎকার তাজা সোনারবরণ খেঁসারি ডাল অথচ এদের বজ্রবিদারণ-মন্ত্রও নেই, দ্বাবিংশপিশাচভয়-ভঞ্জনও নেই—হাজার প্রকার ভয় তাড়ানোর কোন মন্ত্রই নেই—বুঝি



এদের কোন ভয়ই নেই। অথচ—কিম্বা বুঝি সেই জন্যেই—এই শোণপাংশুদের এমন একটা শ্রী আছে, এমন একটা উল্লাস আছে যে অচলায়তনের বালকদেরও তা নাই।

কারণ এই যে শোণপাংশুরা—এরা বেড়ে উঠেছে আপনারই আনন্দের ভিতর দিয়ে। এদের দৈনন্দিন কর্ম্মগুলো এদের এমন একটা সার্থকতা পাইয়ে দিয়েছে—এমন একটা রস পাইয়ে দিয়েছে যে সেই রসের আনন্দে তাদের প্রাণ ভরপুর; আর সেই প্রাণের আনন্দ, তাদের চোখে মুখে ললাটে আপনার ছায়া ফেলে তাদের করে তুলেছে শ্রীমান্, আনন্দমূর্ত্তি। কিন্তু ঐ যে "অচলায়তন" যেখানে দশ হাজার শ্লোকে মিলে বিশ হাজার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিচ্ছে—সেখানকার যে মানুষগুলো—তারা চল্‌ছে না, বসে রয়েছে—জীবন-দেবতার আনন্দে নয়। কারণ এরা যা কিছু করে, যা কিছু শেখে তার সঙ্গে এদের প্রাণের যোগ কোনখানেই নেই—এমন কি বুদ্ধির যোগও নেই। কারণ তাদের যে-সব মন্ত্র-তন্ত্র ক্রিয়া-কলাপ তার সম্বন্ধে কারও কোন প্রশ্ন করবারও অধিকার নেই। "হয় সেটা মান, নয় কানমলা খেয়ে বেরিয়ে যাও, মাঝে অন্য রাস্তা নেই।" এ সবের সঙ্গে এদের যে যোগ সেটা হচ্ছে অভ্যাসের যোগ—আর এই অভ্যাস সম্ভব হয়েছে অতীতের শাসনে। আর সেইজন্যে এদের মধ্যেকার যে "মানুষটা" সেটা বয়ে চলেছে একটা বিরাট ব্যর্থতা। কারণ মানুষের সম্বন্ধে সবার চাইতে সত্য যে কথাটা সেটা হচ্ছে এই যে, মানুষ কল নয়। কিন্তু এমনি অভ্যাসের বল যে, এরা যে একটা বিরাট ব্যর্থতাকে বহন করে চলেছে সে কথাটাও এরা জান্‌ছে না—কেবল যে জান্‌ছে না তাই নয়, উল্টে আবার মনে করছে যে এইই অমৃত এইই মুক্তি এইই

আনন্দ। কিন্তু তবুও এদের মধ্যেকার "মানুষ" একেবারে মরে নি। এখনও একটু একটু তার স্পন্দন আছে। তাই যেদিন দাদাঠাকুরের দল এসে অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙ্গে মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে দিলে আর সমস্ত আকাশটা যেন ঘরের মধ্যে দৌড়ে এল, সেদিন তাদেরও প্রাণটা নেচে উঠলো—সেদিন যখন বালকেরা শুনলে যে ষড়াসন বন্ধ, পংক্তি-ধৌতির দরকার নেই তখন তারা দুঃখিত হল না মোটেই—সেদিন তাদের "কি মজা রে কি মজা।" পঞ্চকের দু' ধারে এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। একদিকে শোণপাংশুরা, আর একদিকে "অচলায়তন"—একদিকে তার প্রাণের ডাক গানের ডাক, আর একদিকে তার অতীতের আদেশের, অতীতের শাসনের ডাক—একদিকে খোলা আকাশের ডাক, আর একদিকে বন্ধ পুঁথির ডাক—একদিকে জীবনের আনন্দের ডাক, আর একদিকে মরণের শান্তির ডাক। পঞ্চককে কে জিতে নেবে? মানুষ কোথায় আপনার অমৃত খুঁজে পাবে? পঞ্চক তার মুক্তি অচলায়তনের বন্ধ পুঁথির শ্লোকের মাঝে খুঁজে পেলে না, খুঁজে পেলো তা খোলা বাতাসের সুরের মাঝে—মানুষ বুঝেছিল তার অমৃত, আঁধার-ঢাকা অচলায়তনের মধ্যে নেই, তা আছে আলোকমাখা আকাশের তলে।

এইটেই হচ্ছে আসল কথা। মানুষের মুক্তি, মানুষের অমৃত—তা আছে কোথায়? তার ধরে' রাখার মধ্যে নয়, তার ছাড়া-পাওয়ার মধ্যে। মানুষের হাত পা বোঝা হয়ে ওঠে তখন, যখন এদের বসিয়ে রাখা যায়—নইলে এরা মানুষের আনন্দেরই কারণ। আসল কথা হচ্ছে মানুষের সম্বন্ধে একটা ভগবানের বিধি আছে—তার হাত পা চোখ কান মন প্রত্যেকের, ভগবান-দত্ত একটা ধর্ম্ম আছে। মানুষের মঙ্গল ও আনন্দ আছে সেই সেই বিধি মানার মধ্যে, হাত পা চোখ



কান মনের সেই সেই ধর্ম্ম-উদযাপনের মধ্যে। মানুষের অমৃত এদের মেরে ফেলবার মধ্যে নেই—আছে এদের জ্যান্ত করে' তোলবার মধ্যে। এই হচ্ছে ভগবানের বিধি—মানুষের জীবন-দেবতার ধর্ম্ম—তার সত্য কথা।

ঐ যে অচলায়তনের দল আর শোণপাংশুর দল এদের মধ্যে ঐ শোণপাংশুর দলই জীবন-দেবতার সত্যিকার কথা মেনে চলেছে—তাই তাদের বেঁচে থাকার মধ্যে একটা পূর্ণ সার্থকতা রয়েছে—একটা জমাট আনন্দ রয়েছে—আর তাই এ জগৎটা তাদের কাছে মিথ্যা হয়ে ওঠে নি, মায়া হয়ে ওঠে নি। কিন্তু তবুও এই শোণপাংশুদের একটা মস্ত অসম্পূর্ণতা, একটা প্রকাণ্ড অভাব রয়ে গেছে—যেটা পঞ্চকেরও চোখ এড়িয়ে যায় নি।

কারণ এই যে শোণপাংশুরা এরা জীবন-দেবতার কথা মেনে চলছে বটে কিন্তু জানছে না যে এরা জীবন-দেবতার কথা মেনে চলছে। আর তাই "এরা বাইরে থাকে বটে কিন্তু বাহিরটাকে দেখতেই পায় না।" কারণ এরা আপনার ভিতরটাকে মানে নি। দাদাঠাকুরের সঙ্গে এদের চোখের পরিচয় আছে বটে—কিন্তু তাকে এরা মন দিয়ে জানে না, প্রাণ দিয়ে চেনে না। দাদাঠাকুরকে এরা দাদাঠাকুর বলেই জানে ওরু বলে চেনে না। এতে বিপদের সম্ভাবনা আছে—চাই কি, একদিন এরা অহঙ্কারে মত্ত হয়ে দাদাঠাকুরের অপমানই করে বসবে।

মানুষের সকল অমঙ্গলের সূচনা হয় তখন যখন সে জীবন-দেবতাকে তার অন্তর থেকে নির্ব্বাসিত করে তার মনের সিংহাসনে অহং-দেবতার আসন পাতে। মানুষের জীবন মিথ্যা দিয়ে ভরে ওঠবার সুযোগ পায় তখনই। এ মিথ্যা আপনাকে বিস্তার করতে পারে দু'দিকে। এক

নীচুদিকে আর এক উঁচুদিকে—এক মানুষকে অস্বীকার করার দিকে, আর এক মানুষকে অতিমাত্র স্বীকার করার দিকে—এক "অচলায়তনের" দিক, আর এক মানুষের শক্তির দানবী-লীলার দিক।

কারণ ঐ যে "অচলায়তন"—তার প্রত্যেক পাথরটী খাড়া হ'য়ে উঠেছে মানুষের বিরাট অহঙ্কারের উপর—হাজার বালকের চোখের জল দিয়ে এর চুন শুর্‌কি গোলা হয়েছে—সুভদ্র যে উত্তরদিকের জানালা খুলতে চেয়েছিল বলে' তাকে ছয়মাস অন্ধকার কুঠুরীতে পুরে রাখবার মন্ত্রণা হয়েছিল—অষ্টাঙ্গশুদ্ধি উপবাসে তৃতীয় রাত্রে বালক কুশলশীল যে পিপাসায় জল জল করে' প্রাণত্যাগ কর্‌লে, তবুও তার মুখে কেউ একবিন্দু জল দিলে না—এ সবের পিছনে যে একটা মস্ত বড় সত্ত্বগুণের খেলা চল্‌ছে তা মনে কর্‌বার কোন কারণ নেই—এসব হচ্ছে মানুষের অহঙ্কারের তামসিক লীলা—আর এর অন্যদিকটা হচ্ছে মানুষের অহঙ্কারের রাজসিক লীলা—যে লীলার—কতকটা উপশমের নিতান্ত দরকার হয়েছিল বলে', বোধ হয় আরব্ধ হয়েছে বর্ত্তমান ইয়োরোপের মহাসমর।

এইখানেই মানুষের বিপদ। এই বিপদ থেকে বাঁচতে হলে চাই, জীবন-দেবতার সঙ্গে মানুষের নিবিড় মিলন। দাদা-ঠাকুরকে দাদা-ঠাকুর বলেও জান্‌তে হবে আবার গুরু বলেও মান্‌তে হবে। "দাদাঠাকুরের মুখের কথাকে মনের ইচ্ছা করে তুল্‌তে হবে।" আর এ কর্‌তে হলে সারাদিন শোণপাংশুদের খালি পাক খেয়ে বেড়ালে চল্‌বে না। তাদের একটু বস্‌তে শিখ্‌তে হবে। আর এর জন্য দরকার মহাপঞ্চক। "কি করে আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে উঠতে হয়" তার মন্ত্র—"ক্ষুধা তৃষ্ণা লোভ ভয় জীবন মৃত্যুর আবরণ বিদীর্ণ করে আপনাকে প্রকাশ করার রহস্য" আছে ঐ মহাপঞ্চকের হাতে। সেই



জন্য মহাপঞ্চকেরও দরকার একটা বড় রকমের দরকার—ঐ "অচলায়তন" ভেঙ্গে সেখানে আকাশের আলোর মধ্যে অভ্রভেদী করে দাঁড় করান হবে যে নূতন শুভ্র সৌধ, সেই নূতন সৌধের মাঝে। এই মহাপঞ্চক যেদিন শোণপাংশুর অন্তরে গিয়ে বস্‌বে—শোণপাংশু যেদিন মহাপঞ্চকের দেহে গিয়ে লাগবে—যেদিন মহাপঞ্চকের আত্মজয়ের উপরে স্থাপিত হবে শোণপাংশুর কর্ম্ম-ব্যঞ্জনা, যেদিন শোণপাংশুর প্রবৃত্তি মহাপঞ্চকের সংযম দিয়ে নিয়মিত হবে—সেদিন মানুষ হবে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার—দেবতার চাইতেও মহীয়ান্—দেবতার চাইতেও গরীয়ান—ভগবানের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

———

# শিক্ষা-সমস্যা।

—*—

আমাদের দেশের শিক্ষা-সমস্যা নিয়ে আজ পর্য্যন্ত যে গোলমালটা হচ্ছে তার মধ্যে ছাত্র-সমাজের কেউ কোন কথা বলেছেন কিনা জানি নে—যদি বা বলে থাকেন তবে এই গোলযোগে সেটা যে কারও কানে পৌঁছয় নি তা সুনিশ্চয়। ছাত্র-সমাজের মুখপাত্র হয়ে কোন কথা বলবার অধিকার আমার নেই, ছাত্র-জীবনের অভিজ্ঞতার দাবীতে কয়েকটা কথা বলতে চাই, গোলযোগ বাড়াবার তরে নয়, যাঁদের শিক্ষার কথা নিয়ে তর্ক উঠেছে তাদের কোন দিক থেকে বিচার করতে হবে সেটা দেখান আমার কাজ। আমরা যে হাজারে হাজারে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুয়ারে প্রত্যহ হাঁটাহাঁটি করছি তার ফলে পেয়েছি কি? অর্থাৎ আমরা দেখতে চাই আমরা কি শিখছি তা হলে স্পষ্টই বোঝা যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ কতদূর এগিয়েছে বা পিছিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ফলে আমাদের মধ্যে যথেষ্ট শিক্ষার বিস্তার হয়েছে, আগের চেয়ে অনেক এগিয়েছে, University calender খুলে ডিগ্রীধারীর সংখ্যা নিরূপণ করে একথা বলতে অনেকে ছুটে আসবেন জানি, কিন্তু অন্য দেশে যাই হোক এখানে অমন ধারা অঙ্ক কষে কোন ফলই পাওয়া যাবে না। যদি কিছু পাই সেটা ফাজিল ভিন্ন আর কিছু নয় বলেই মনে হয়, কাজেই সেটাকে বাদ দেওয়াই উচিত। তার কারণটা পরে বলছি।

ব্রজেন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বা আশুতোষ সব দেশে দু একটী করে এসে থাকেন কাজেই তাঁদের দোহাই দিলে আমরা শুনবো না,



আমাদের দেখতে হবে সাধারণ ছাত্রের অবস্থা। তারা যে আদর্শ যে ব্যবস্থা যে আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হয়ে উঠছে সেই আদর্শ, ব্যবস্থা ও আবহাওয়া শিক্ষার পক্ষে যথেষ্টরূপে উপযোগী কিনা তাই আমাদের বিচার্য্য। অন্য দেশের বিধিব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করে কাজ নেই কারণ এখানে তুলনা করা দুঃসাহস ভিন্ন আর কিছুই নয়। অবশ্য আমার কথার উত্তরে অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কা মারা ডাক্তার, উকীল, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি দেখিয়ে বলবেন যে আগে আমাদের দেশে এ সব ছিল না; এ কথা মানি কিন্তু এ সব হয়ে যে বিশেষ উপকার হয়েছে তার লক্ষণ ত বড় বেশী দেখতে পাই নে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা না পেলে মানুষ হিসেবে এঁরা যেমন থাকতেন এখনও তেমনি আছেন, অন্ততঃ আমার ত তাই বিশ্বাস।

শিক্ষার আদর্শ যাই হোক না, এখানে সেটা যে অচল তা আমরা সবাই জানি, অবশ্য জ্ঞানলাভ করবার জন্যে জ্ঞানের চর্চ্চা করে সব দেশেই এমন লোক কম কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপার্জ্জিত জ্ঞান কাজে খাটাবার মত শিক্ষা সকলেই পায়। জ্ঞান জিনিসটা মনের সঙ্গে একেবারে মিশে যায়, যা মেশে না তা জ্ঞান নয়—কিন্তু আমাদের অর্জ্জিত বিদ্যা যে জ্ঞান নয় তার প্রমাণ, আমাদের প্রাণের সঙ্গে তার কোন যোগ নেই, যদি থাকত তবে কোননা কোন আকারে তার প্রকাশ হত। আমাদের এই বিদ্যাটা নিতান্ত অবিদ্যার মত ঘাড়ের উপর বসে রক্ত মাংস খাচ্ছে শুধু তাই নয় প্রাণ পর্য্যন্ত শুষছে। তাই আমরা যত শীঘ্র পারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দেউড়ী পার হয়েই এই যুগ সঞ্চিত বিদ্যার বোঝা ফেলে দিয়ে ঘরে ফিরি এবং বাপ দাদা যেমন করে জীবন কাটিয়ে ছিলেন সেই ধারা বজায় রাখবার চেষ্টা করি। কিন্তু দুঃখের বিষয়

কোন রকমে আর খাপ খাওয়াতে পারি না—আমাদের সেই আলস্যময় জীবনের উপর আমাদের অর্জ্জিত বিদ্যা যেন দুঃস্বপ্নের মত চেপে থাকে। আমাদের দ্বারা আর কিছু হবার সম্ভাবনা থাকে না। আমাদের ছাত্রজীবনের চারিদিকে শিক্ষার কোন আবহাওয়া নেই বল্লে অত্যুক্তি হবে না। এই একটা সময় যখন জীবনে যা কিছু বড়, যা কিছু সত্য, যা কিছু সুন্দর তাকে আমরা সারা প্রাণ দিয়ে পূজা করতে পারি—এই সময়ে আমরা এমন অনেক জিনিস বিশ্বাস করি বিজ্ঞেরা যা শুনলে অবজ্ঞার হাসি হাসবেন। কিন্তু এই বিশ্বাসের এই আরাধনার আবহাওয়ার মধ্যে আমরা থাকতে পাই নে। দোষটা যে আমাদের নয় তার কারণ আবহাওয়াটা তৈরী আমরা করি নে—যথার্থ শিক্ষার চারদিকে সেটা আপনি গড়ে উঠে এবং ছাত্র-জীবনের খোলা দরজার মধ্যে সেটা আপনি ঢুকে পড়ে মানুষ গড়বার যথেষ্ট উপাদান এনে দেয়।

আমাদের অভিভাবক ও শিক্ষক এই দুটি-পথ আটকে বসে আছেন। শিক্ষার আদর্শকে তারা এমন খর্ব্ব করেছেন, শিক্ষার আবহাওয়াটা তাঁরা এমনি ঘুলিয়ে রেখেছেন, যে সেখানে থাকলে আমরা হাঁপিয়ে উঠি, কাজেই আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা কিসে দম নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারি কারণ পৈতৃক প্রাণটা বাঁচাবার সম্বন্ধে চাচার অনেক উপদেশ আমরা প্রত্যহই পাই।

( ২ )

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণাগুণ বিচার হয় পরীক্ষার সাহায্যে। শিক্ষিতজনের পক্ষে পরীক্ষা নাকি কষ্টিপাথরের মত কাজ করে। কষ্টিপাথরের মর্য্যাদা তার দ্বারা যে ধাতুর পরীক্ষা হয় সেই ধাতুর উপরে



নির্ভর করে তার নিজের দাম নিয়ে কেউ বড় মাথা ঘামায় না—এখানে কিন্তু তার উল্টোটাই হয়েছে—শিক্ষা যত হোক আর না হোক পরীক্ষার উপর সকলেরি ঝোঁক, কাজেই তার দাম অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছে। কোন রকমে তার উপর আঁচড় ফেলতে পারলেই আমাদের কাজ শেষ হয়ে যায়। শিক্ষার চেয়ে পরীক্ষার দাবী গুরুতর হয়ে ওঠায়, শিক্ষা ছেড়ে আমরা পরীক্ষাকে প্রাণপণ আঁকড়ে ধরেছি, কোন রকমে চোখ কাণ বুজে বৈতরণীটা পার হয়ে যাই, তারপর কি তা জানি না। আমি পরীক্ষার উপর কটাক্ষপাত করছি না যাতে পরীক্ষার অর্থটা পরিষ্কার হয়ে উঠে তার চেষ্টা করছি।

পরীক্ষাভীতিটা আমাদের মধ্যে যে সংক্রামক হয়ে উঠেছে তার কারণ পরীক্ষার উদ্দেশ্য আর পরীক্ষকের কিম্বা বিশ্ববিদ্যালয়-কমিটীর উদ্দেশ্য এক নয়। অনেকে হয়ত University regulations খুলবেন আমার কথার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করতে, যেমন নারী-সমস্যা নিয়ে কথা উঠলে তাঁরা মনু খুলে বসেন। কিন্তু ব্যাপারটা বাস্তবিক তা নয়। মনুতে যা লেখা আছে তা মানলে বোধ হয় কোন তর্ক উঠত না—University regulations-এ যা লেখা আছে তা মেনে চললে হয়ত পরীক্ষাটা অত ভয়ের কারণ হয়ে উঠত না। শিক্ষার আদর্শ এইখানেই খর্ব্ব হয়েছে—শিক্ষকদের ও অভিভাবকদের কাছে আমরা যেমন শুনি তাতে পরীক্ষাকে একটা সঙ্কট মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। কেমন করে আদর্শ খর্ব্ব হয়েছে তা নিয়ে বিচার করবার মত বিদ্যা বা সময় আমার নেই, তবে বর্ত্তমানের এই খর্ব্বতার মূলে আমরা যাঁদের দেখতে পাই তাঁদের সম্বন্ধে দু একটী কথা বলতে চাই, তাহলে আমাদের কথাটা পরিষ্কার হয়ে আস্‌বে।

বাড়িতে অভিভাবক ও স্কুল কলেজে শিক্ষক ও অধ্যাপক তাঁদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এত বেশী সজাগ হয়েছেন যে আমাদের নিজের হাতে করবার মধ্যে কেবল নোট মুখস্থ ছাড়া আর কিছু নেই। এ বিষয়ে আমরা এক একটী কল রনে গেছি—আমাদের ভুলতে হয়েছে যে আমরা নিজেরা ভাবতে পারি, চিন্তাশক্তি কাজে খাটাতে পারি, সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারি—আমাদের মনের এই স্বাভাবিক গতিটুকু এখন মাষ্টারের নোটের খাতার মধ্যেই বন্ধ। নিজের বিদ্যা বুদ্ধি বা সহজ জ্ঞানের উপর কিছুমাত্র নির্ভর না করার ফলে নিজের শক্তির উপর আস্থা বড় কম হয়ে যায়। আমাদের হয়েছেও তাই।

গতানুগতিক ভাবে জীবনটাকে কোন রকমে কাটিয়ে দেওয়াকে যাঁরা চরম মনে করেন তাঁদের কাছে নতুন কিছু আশা করা অবশ্য নিরর্থক হবার জন্যই। আমাদের শিক্ষক সম্প্রদায়ও এর হাত থেকে পরিত্রাণ পান নি। তাঁরা যে বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত নন তা নয়, কিন্তু সে পদ্ধতি যে আমাদের দেশে খাটে ও তাতে যথেষ্ট সুফল আশা করা যায় এমনতর চিন্তা তাঁরা করেন কিনা সে বিষয়ে মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়। তাঁরা যে নিয়মে শিখেছেন সেই নিয়মেই শেখাতে চান, পরিবর্ত্তনের কথাটাকে কোন রকমে আমল দিতে চান না—যদিও তাঁরা জানেন যে আগের ব্যবস্থা অভ্রান্ত নয় এবং আগে যা চলেছে এখন তা নাও চলতে পারে। মনের প্রসার, জ্ঞানের গভীরতা, চিন্তা-শক্তির বৃদ্ধির দিকে তাঁদের নজর যতখানি পরীক্ষার সাফল্যের দিকে দৃষ্টি তার চেয়ে ঢের বেশী। তাঁরা যে আমাদের মঙ্গল চেষ্টা করছেন সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই কিন্তু উদ্দেশ্য ও উপায় একেবারে ভিন্ন হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার



উদ্দেশ্য যদি চাকরীর সুপারিশ হয় তবে তাঁরা যে ঠিক কাজ করছেন এ কথা সবাই বলতে বাধ্য কিন্তু উদ্দেশ্য ঠিক ঐটি কিনা তা নিয়ে কিছু গোল আছে! যাই হোক তাঁরা যে কোনও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে কাজ করুন না কেন, তার ফলে আমাদের অবস্থা বড় বিষম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উপদেশের চেয়ে উদাহরণের জোর ঢের বেশী। নোট সম্বন্ধে একথা বিশেষ করে খাটে। আমরা যে আদর্শ ধরে কাজ করি তাতে নোটই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। কেবলমাত্র syllabus বজায় রেখে আমরা চলি বলে আমাদের স্বাধীন চিন্তার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। এ বিষয়ে আমাদের অবকাশ থাকলেও নিজেদের আগ্রহ ও উপর-ওয়ালার উৎসাহ যথেষ্ট কম। স্বাধীন চিন্তায় উৎসাহ না পাওয়ায় আমরা মনে এক একটী কুঁড়ের বাদশা হয়ে দাঁড়িয়েছি। তার ফলে অবকাশ পেলেও পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হওয়া ছাড়া কোন রকম পরিশ্রমে অভ্যস্ত না থাকার দরুন আর কোন বিষয়ে আমাদের আগ্রহ থাকে না। দোষটা আমাদের কিন্তু আমরা এর জন্যে মুখ্য ভাবে দোষী নই। মানুষের স্বভাবের মধ্যে অনুকরণটা অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। নতুন পথ কেটে যাবার মত সাহস ও শক্তি সকলের নেই। কাজেই বাপ দাদার অনুকরণ করাটা আমরা নিজের পথ কেটে যাওয়ার চেয়ে সহজ মনে করি। তার ফল যে কি হচ্ছে সে দিকে আমাদের মোটেই লক্ষ্য নেই, কারণ আমরা চিন্তার কোন ধার ধারি না সে কাজটা আমাদের শিক্ষকের হাতেই ন্যস্ত আছে।

আমাদের প্রধান সমস্যটা এইখানেই। আমরা বলি শিক্ষক মশায় ঠিক পথটা দেখিয়ে দিন সারা পথ হাতধরে নিয়ে যাবার কোন দরকার

দেখি না। হয়ত আমরা পা ফেল্‌তে ভুল করতে পারি কিন্তু তা বলে নিজের শক্তিকে অবিশ্বাস করে শক্তিকে অকেজো করে তোলবার চেষ্টার মধ্যে সত্য নেই। যে ব্যবস্থায় পৃথিবীর সকল সভ্যদেশে সুফল পাওয়া যাচ্ছে শুধু আমাদের দেশে তার ব্যতিক্রম হবে এ কথার কোন মানে নেই এবং এ ব্যবস্থায় কোন কোন স্থানে সুফল ফলেছে তাও আমরা জানি।

আমাদের শিক্ষালাভের পথে আরও দশ রকমের বাধা আছে কিন্তু সে-সবের বিচার কয়েকবার হয়ে গেছে। শিক্ষকের লক্ষ্য, শিক্ষার আদর্শ নিয়ে যারা তর্ক করছেন তাঁরা তর্ক করুন কিন্তু যাঁরা আমাদের মঙ্গলের চেষ্টায় আছেন তাঁদের কাছে সবিনয় নিবেদন পরীক্ষা-সঙ্কটের এই চোরা-বালি থেকে তাঁরা আমাদের উদ্ধার করুন। শিক্ষা যদি যথেষ্ট পাওয়া যায় তবে পরীক্ষা যেমনই হোক তাকে সঙ্কট মনে করবার কোন কারণই থাকবে না। অধিকন্তু আমরা কিছু না শেখবার জন্যে যদি দেহ মন প্রাণ সব জখম করতে পারি কিছু শেখবার জন্যে তার চেয়ে কিছু বেশী করতে পারব এ সুনিশ্চয়।

আমরা হোমরুলের আবেদন, কংগ্রেসের নিমন্ত্রণ বা কন্যাপণ নিয়ে চাঁদার খাতা খুলছিনে, আমরা প্রার্থনা করছি যে বর্ত্তমানের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান যেন সার্থক হয়ে উঠে। যা'হক করে এটাকে খাড়া করে রাখার কোন ফল নেই, অন্যায় ক্ষতির পরিমাণ তাতে বাড়বে বই কমবে না। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় চেষ্টা করুন যাতে প্রধান সমস্যাটার সমাধান হয়, অনুকরণের যুগে পশ্চিমের অনুকরণ ত অনেক করেছি এখন একটু বুঝে অনুসরণ করলে যথেষ্ট উপকার হবে।

শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।

---